দ্বিতীয় অধ্যায়

উৎপল দত্তের জীবন : রাজনৈতিক দীক্ষা ও নাট্যকার সত্তা

ছেলেবেলা ও পারিবারিক জীবন :

উৎপল দত্ত, পুরো নাম উৎপলরঞ্জন দত্ত। জন্ম ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। উৎপল দত্তের জন্মস্থান নিয়ে নানারকম মতভেদ আছে। উৎপল দত্ত নিজে খানিকটা উচ্চ সংস্কৃতি বোধসম্পন্ন রহস্য প্রিয়। তিনি বলতেন তাঁর জন্মস্থান শিলংয়ের মামার বাড়িতে। যাইহোক, উৎপল দত্তের আদি বাসস্থান ছিল অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায়। বিভিন্ন পারিবারিক সূত্র যাচাই করে দেখা গেছে যে তাঁর প্রকৃত জন্মস্থান ছিল কীর্তনখোলা বরিশালে।

উৎপল দত্তের পিতার নাম গিরিজারঞ্জন দত্ত। মাতা শৈলবালা দত্ত। পিতামহ ছিলেন দ্বিজদাস দত্ত। পাঁচ ভাই তিন বোনের মধ্যে উৎপল দত্ত ছিলেন চতুর্থ সন্তান। পিতৃদত্ত নাম ছিল উৎপলরঞ্জন দত্ত। চলতি নাম শংকর যা পারিবারিক ধর্মগুরু ভোলানন্দ গিরি মহাশয় দিয়েছিলেন। পরে তিনি এ নাম পরিহার করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি উৎপল দত্ত নামই ব্যবহার করেন।

উৎপল দত্তের পিতা গিরিজারঞ্জন দত্ত ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত ও রাশভারী মানুষ। পরাধীন ভারতের যে উচ্চবৃত্ত শ্রেণি ব্রিটিশ প্রভাবে অগ্রণী শক্তিরূপে বিকশিত হয়েছিল সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। গিরিজারঞ্জন প্রথম জীবনে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। পরে ইংরেজি অধ্যাপনা ছেড়ে ব্রিটিশ সরকারের জেলার চাকরি গ্রহণ করেন। সরকারি চাকরির কারণে বহু জায়গায় বদলি হওয়ার জন্য ভাইবোনদের সঙ্গে উৎপল দত্তকেও নানা স্থানে ঘুরতে হয়েছে। তাই পড়াশোনা করতে হয়েছে অবিভক্ত বঙ্গদেশের নানা স্থানে।

বাবা ব্রিটিশরাজের একজন বড়কর্তা ছিলেন। উৎপল দত্তের শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল শৈল শহর শিলং-এ। সেখানকার সেন্ট এডমন্ড স্কুলে ১৯৩৫ সালে ভর্তি হন। এক কুলীন অভিজাত পরিবেশে ইংরেজি পাঠক্রম-এর মাধ্যমে তার ছাত্রজীবন শুরু। বাড়িতে পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবেশে শেকসপিয়র সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেত। মেজদা মিহিররঞ্জন দত্ত কিশোর উৎপলকে শেকসপিয়রের নাটকের গল্প পড়ে শোনাতো। তাদের অভিজাত বাড়িতে রেকর্ড চালিয়ে নাটক শোনার চল ছিল। উৎপল দত্ত সেইসব নাটক খুব মন দিয়ে শুনতেন ও সংলাপ মনে রাখার চেষ্টা করতেন। উৎপল দত্রের মননে চিন্তনে পাশ্চাত্য শিক্ষার বীজ এভাবেই রোপিত হয়েছিল। এরপর

উৎপল দত্তের বাবা গিরিজারঞ্জন দত্তকে বদলি করা হয়েছিল বহরমপুর জেলার রূপে। উৎপল দত্ত ও তার অনুজ নীলিন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। তার পিতা গিরিজা রঞ্জনের উপরে বহরমপুরে সরকারি আবাসনে আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল। আর সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন কিশোর উৎপল দত্ত। হয়তো সেই বিপ্লবের দুর্জয় সাহস আর গভীর আত্মবিশ্বাস তার ব্যক্তিত্বে প্রবেশ করেছিল। তাছাড়া সেই সময় বহু রাজনৈতিক বন্দি ও বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেছিল। তাদের উপরে অত্যাচার নিপীড়ন হত। অতি অল্প বয়স থেকে সেসব দেখার ফলে নিশ্চয়ই গভীরভাবে তার মনে ছাপ পড়েছিল। এই স্মৃতি তার জীবন এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছিল। "যা পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নাটক করতে প্রেরণা যুগিয়েছে।"[১]

বাল্যকাল থেকে উৎপল দত্ত প্রখর মেধাবী ছিলেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণ স্মৃতিসম্পন্ন বালক উৎপল দত্ত মাত্র ছয় বছর বয়স থেকে শেকসপিয়রের বিখ্যাত নাটকের সংলাপ মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। বহরমপুরে থাকাকালীন তার পিতার কাজের সুবাদে নানারকম গুণী মানুষের আগমন ঘটত তার বাড়িতে। অতিথিদের সামনে উৎপল দত্তের ডাক পড়ত। তখন বালক উৎপল দত্ত অতিথিদের সামনে শেকসপিয়রের নাটক থেকে বিভিন্ন সংলাপ আবৃত্তি করে শোনাতেন। তাঁর মেজদা মিহিররঞ্জন দত্ত জানিয়েছিলেন—

> *উৎপল ছবছর বয়স থেকেই শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটকগুলোর বিখ্যাত উক্তিগুলি মুখস্থ করে ফেলেছিল। বাড়িতে কোন অতিথি এলেই দুজনের (উৎপল ও নীলিনের) ডাক পড়ত। উৎপল শোনাত শেক্সপিয়ার থেকে আবৃত্তি।* [২]

বহরমপুরে যখন গিরিজারঞ্জন দত্ত ছিলেন, তখন সেখানে ছিল পাঠান রেজিমেন্ট। শারীরিকভাবে বলিষ্ঠ, কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ, নিয়মনিষ্ঠ এইসব পাঠানদের মধ্যেই কিশোর উৎপল দত্তের দিন কাটত। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তিনি পাঠান বাহিনীর সঙ্গে শারীরিক কসরত করতেন। ছেলের উৎসাহ দেখে গিরিজারঞ্জন উৎপল দত্তকে শারীরিক কসরত করার পোশাক ও এয়ারগান কিনে দিয়েছিলেন। জীবনের উষা পর্বেই উৎপল দত্তের সময়ানুবর্তিতা ও কঠোর শৃঙ্খলার পাঠ শুরু হয়ে যায় যা পরবর্তীকালে উৎপল দত্তের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

স্কুল জীবন :

দশ বছর বয়সে পিতার বদলির কারণে কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায় অভিজাত পরিবেশে সপরিবারে স্থানান্তরিত হন। ১৯৩৯ সালে তার এক ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতার সেন্ট লরেন্স স্কুলে

ভর্তি হন থার্ড স্টান্ডার অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণিতে। কলকাতায় আসার পর উৎপল দত্ত বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতার পেশাদার থিয়েটার দেখতে শুরু করেন। স্মৃতিচারণায় তিনি বলেছেন—

> *আমি, আমার বাবা, আমার মা সকলে মিলে নাটক দেখতাম এবং তৎকালীন পেশাদার নাট্যশালায় যত নাটক হত সবই দেখতাম। সেটা ১৯৪৩-'৪৪-'৪৫ সাল।... মহেন্দ্রগুপ্তের পরিচালনায় স্টার থিয়েটারের প্রযোজনার আমি তো রীতিমতো ভক্ত ছিলাম।* [৩]

পড়াশোনার আগ্রহের পাশাপাশি ক্রিকেট খেলার প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সেন্ট লরেন্স স্কুলটি সেনাবাহিনীর দখলে চলে যায়। ফলে স্কুলটি অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয় দমদমে। বালিগঞ্জের আবাসন থেকে দমদম স্থাপিত স্কুল-এর দূরত্ব অনেকটা বেশি হওয়ায় উৎপল দত্তকে স্কুল ছাড়তে হয়। ১৯৪৩ সালে উৎপল দত্ত বাড়ির কাছে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন।

উৎপল দত্তের শিল্পী সত্তার উন্মেষ ঘটতে শুরু করেছিল সেন্ট লরেন্স স্কুল থেকেই। স্কুলে থাকার সময়ই তার নাটকে হাতেখড়ি হয়। তখন তার বয়স মাত্র তেরো। তবে কলেজে এসেই তার যথার্থ নাট্য জীবনের আরম্ভ হয়। সেন্ট লরেন্স স্কুলে থাকাকালীন সহপাঠীদের সঙ্গে বাংলা নাটকে অংশগ্রহণ করতেন। স্মৃতিচারণায় তিনি বলেছেন—

> *সেন্ট লরেন্স স্কুলে আমরা বাংলায় নাটক করতাম।* [৪]

স্কুলে বিদেশি নাটকও অভিনয় হত। স্কুল জীবনের তিনি মাঝে মাঝে ইংরেজি নাটকে অংশগ্রহণ করতেন। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর অভিনয় তার সহপাঠী ও স্কুল কর্তৃপক্ষের নজর কাড়ে। অভিনয় করার জন্য মাঝে মাঝে তাকে নামী স্কুল সেন্ট জেভিয়ার্সেও পাঠানো হত। স্মৃতিচারণে সেকথা তিনি উল্লেখ করেছেন—

> *অভিনয় করার জন্য মাঝে মাঝে আমাদের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পাঠানো হত।* [৫]

সাহেব পরিচালক ফাদার উইভার-এর অধীনে থেকে তিনি শেকসপিয়রের নাটকে অভিনয় করতে থাকেন। ফাদার উইভারের পরিচালনায় সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে শেকসপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকে তিনি প্রথম অভিনয় করেন ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা 'সাঁসুসি প্লেয়ার্স'-এর প্রযোজনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

স্কুল জীবনের কথা উৎপল দত্ত খুবই কম বলেছেন। যেটুকু বলেছেন তার সবটাই থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সময় থেকে থিয়েটার ও মঞ্চ সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ন ও চর্চা শুরু

হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে ভারতের 'গণনাট্য সংঘের' জন্ম হয়। স্কুলের শেষ পর্যায়ে এসে স্কুলে থিয়েটারের প্রয়োগ ও এই শিল্পের সাধনায় মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তাঁর এই প্রতিভা ও চালচলন ভাবভঙ্গির মধ্যে আভিজাত্যের লক্ষণ দেখে সহপাঠীরা তাঁকে সমীহ করে চলত। ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং ভারতীয় 'গণনাট্য সংঘ' পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসিবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দিয়েছিল তার প্রভাব স্কুল ছাত্র উৎপলকে আলোড়িত করে তুলেছিল। তখন থেকেই উৎপলের কিশোর মনে বিদ্রোহ প্রতিবাদের রেখার জন্ম নিয়েছিল। ১৯৪২ সালে গান্ধিজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রভাব ও অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলন ও প্রতিরোধ তার কিশোর মনকে আন্দোলিত করে তুলেছিল। যার প্রভাব তার পরবর্তী জীবনে ও নাট্যকার সত্তায় গভীরভাবে পরিলক্ষিত। স্মৃতিচারণায় তিনি বলেছেন—

> *স্কুলে থাকতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাল ফৌজের মহান প্রতিরোধ ও প্রত্যাক্রমণের কাহিনী পড়ে চমকিত হতাম। স্তালিনের সহজ ও তীক্ষ্ণ ভাষায় লেখা প্যামফ্লেট ও বই তখন থেকে পড়ছি।* [৬]

কলেজ জীবন :

১৯৪৫ সালে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ মিলিয়ে মোট ছয়টি বছর উৎপল দত্তের জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ছয় বছর তার পরবর্তী চুয়াল্লিশ বছরের শিল্পী জীবনের রেখাচিত্র এঁকে দিয়েছিল। কলেজ জীবনে তার পড়াশোনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা ছিল ঈর্ষণীয়। বহুমুখী উৎপল দত্ত ছিলেন বিচিত্র বিদ্যার অধিকারী, তিনি প্রচুর পড়াশোনা করতেন। বিশ্বসাহিত্য তো বটেই বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করতেন। স্কুল শেষ হতে না হতেই লেনিন, মার্কস, এঙ্গেলস্ প্রভৃতি তার দখলে ছিল। তাছাড়া নিয়মিত পাঠের মধ্যে ছিল ইতিহাস ইউরোপীয় মধ্যযুগীয় আইন ও দেশি-বিদেশি সংগীত তত্ত্ব। নাটক বা নাটক সম্পর্কিত বইপত্র প্রচুর পড়াশোনা করেছিলেন। পিটার ব্রুক, স্তানিভালোস্কিদের বই ছাড়াও শেকসপিয়র প্রভৃতি সমস্ত বই তিনি পড়াশোনা করতেন ও এইসব জগদ্‌বিখ্যাত নাট্যকারদের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন। পৃথিবীর যেখানকার যে নাটক সম্পর্কে বই পাওয়া যেত তার সব সংগ্রহ করে তিনি পড়তেন। নাটক অভিনয় সম্পর্কিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও তিনি সংগ্রহ করতেন। পড়াশোনা বিষয়ে সেন্ট জেভিয়ার্সের পাঠাগার তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কলেজ জীবনে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে তিনি অভিনয় চালিয়ে যেতেন। কলেজে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের একান্তে শেকসপিয়রের নাটকগুলো ভালো করে পড়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে নিকোলাস গোগলের 'ডায়মন্ডস কাটস্ ডায়মন্ড'-এ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত কলেজজীবনে নাট্য অভিনয় শুরু করেন। তার সহপাঠী অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রতাপ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ তখন ছিল নাট্যচর্চার জন্য বিখ্যাত। নাট্যচর্চা ও অভিনয়ের জন্য আদর্শ জায়গা ছিল এই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। তখন যারা শিক্ষক ছিলেন তাদের তত্ত্বাবধানে থাকলে থিয়েটারে না এসে উপায় ছিল না। উৎপল দত্তের ভাষায়—

> *সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কেউ কেউ যে থিয়েটারে আসেনি, এটাই আমার কাছে আশ্চর্যের। ওই কলেজে পড়লে... থিয়েটারে না এসে উপায় ছিল না... এরকম একটা থিয়েটার সমস্ত যন্ত্রপাতি সমেত— আমি খুব কম দেখেছি।* [৭]

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে উৎপল দত্ত ও তাঁর সহযোগীরা ইংরেজি নাটক করতেন অধিকাংশরই নাটক, গুগোল ও মলি-এর নাটক ছিল। তবে তিনি শেকসপিয়রের নাটক বেশি উপভোগ করতেন। এইসময় থেকে শেকসপিয়রের নাটকের সঙ্গে তার একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সারা জীবন সেই সম্পর্ক তাহার অন্তর আত্মার ভিতর, তার শিরায় উপশিরায়, তার রক্তের গভীরে কাজ করে গেছে।

উৎপল দত্ত কলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের প্রথম বর্ষে ১৯৪৫-৪৬ সালে তিনি কলেজে প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষেও মোট ৯০০ নাম্বারের মধ্যে ৭১০ নাম্বার পাওয়ায় প্রথম পুরস্কার তার দখলে ছিল। তার প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস অথচ স্নাতক শ্রেণিতে তিনি সাম্মানিক হিসেবে ইংরেজি বিষয়কে বেছে নিয়েছিলেন। তার কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছিলেন—

> *ও শালার এমন সিলেবাস যার শুরুও নেই, শেষও নেই। অত পড়ার সময় কোথায়? তাহলে থিয়েটারটা শিকেয় উঠবে। সেটা করবে কে?* [৮]

কিন্তু বিদেশি বিষয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন ইংরেজি চয়ন করার কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন—

> *ফাঁকি দেওয়া যাবে। ইংরেজি নিলাম কারণ বানিয়ে কিছু অন্তত লিখতে পারব।* [৯]

কলেজের তৃতীয় বার্ষিক স্নাতক ফাইনাল পরীক্ষায় তিনি ৯০০ নাম্বারের মধ্যে ৫১১ পাওয়াতে তার নাম সসম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হত। বলা বাহুল্য ইতিহাস তার প্রিয় বিষয় হলেও ছাত্র জীবনে তার প্রবন্ধের বিষয় ছিল মূলত শিল্প ও সাহিত্য।

বহুমুখী উৎপল দত্ত তার নিজের প্রতিভার ছটা বিভিন্ন অঙ্গনে নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন বিভিন্নভাবে। উৎপল দত্তের কলেজ জীবনে অন্যতম প্রিয় বিষয় ছিল আবৃত্তি। ছোটোবেলা থেকেই আমরা দেখেছি আবৃত্তির প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। বাড়িতে গুণীজনের আগমন ঘটলে তাঁর ডাক পড়ত আবৃত্তি শোনানোর জন্য। কলেজ জীবনেও সেই আবৃত্তির ধারা সমানভাবে বজায় রেখেছিলেন ও কলেজে আবৃত্তিতে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। কলেজ ম্যাগাজিনে জানা যায়—

> *আন্তঃকলেজ আবৃত্তি প্রতিযোগীতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে নীলিন যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন।* [১০]

আবৃত্তির পাশাপাশি বিতর্কেও উৎপলের আগ্রহ ছিল। কলেজে পড়াকালীন বা তার পরবর্তী সময়েও উৎপল দত্ত আর বিতর্ক যেন প্রতিশব্দ ছিল। তিনি বিভিন্ন যে প্রবন্ধ লিখেছেন বা যখনই বক্তৃতা করেছেন তিনি একটি প্রতিপক্ষ তৈরি করতেন। সেই প্রতিপক্ষকে যুক্তি-তর্কে-উপহাসে-কৌতুকে নাস্তানাবুদ করেই তিনি মজা পেতেন। তাঁর বহু নাটকে বিতর্ককে স্থান দিয়েছিলেন বিষয়বস্তু হিসেবে। উৎপল দত্তের বিতর্কের প্রতি এই ভালোবাসা কলেজ জীবন থেকেই শুরু হয়। বহু তার্কিক; নৈয়ায়িককে অনায়াসে যুক্তি তর্কে পরাস্ত করতেন। বিতর্ক বিষয়ে তিনি এতটাই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে, শোনা যায়—

> *সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াকালীনই উৎপল দত্ত অসামান্য খ্যাতি পেয়েছিলেন 'ডিবেটর' হিসেবে, গেছিলেন কেম্ব্রিজ। শোনা যায় এশীয় বিতর্ক প্রতিযোগীতায় তিনি সম্মানীয় স্থান অর্জন করেছিলেন।* [১১]

সংগীত তার জীবনের সবচেয়ে পুরানো সঙ্গী। ভারতীয় পাশ্চাত্য সংগীত উৎপল দত্তের মতো দক্ষতা বাংলা নাট্য ও চলচ্চিত্র জগতে খুবই বিরল। ভারতীয় মার্গ সংগীত ছোটোবেলা থেকেই তার বড়ো দিদির মাধ্যমে শিখতে শুরু করেন বহরমপুর থাকাকালীন। তার উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল এই মার্গ সংগীত। কলেজ জীবনে যখন তিনি নাটকের কাজ নিয়ে পুরোদমে ব্যস্ত, সে সময়েও ভারতীয় মার্গ সংগীতের অনুষ্ঠান সারা রাত্রি ব্যাপী শুনেছেন। কখনও বা ফুটপাথে বসেই। আর পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের প্রতি আকর্ষণ তার অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষার ফলে সৃষ্ট। কিছুটা বন্ধু-বান্ধবের প্রভাবও আছে। এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

> *যখন আমরা ইংরেজি দল করতে শুরু করিনি, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ছি, তখন থেকেই পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম।* [১২]

ওয়াটার্লু স্ট্রিটের গ্রামোফোন ক্লাবের সদস্য হয়েছিলেন উৎপল দত্ত, প্রতাপ রায়, সলোমন বেখর।

শুধুমাত্র প্রতি বুধবার পাশ্চাত্য সংগীতের রেকর্ড শুনবেন বলে। সহপাঠী প্রতাপ রায় ও উৎপল দত্ত মনস্থির করলেন পাশ্চাত্য সংগীতের সর্বাধুনিক রেকর্ডগুলি কিনবেন অথচ পকেটে পয়সা কম। শর্ত ছিল এক সপ্তাহ করে এক এক জনের মালিকানায় থাকবে এই রেকর্ডগুলো। পিয়ানো শেখার প্রবল আগ্রহ ছিল উৎপল দত্তের মধ্যে। পিয়ানো শেখার জন্য তিনি ভর্তি হয়েছিলেন 'ক্যলকাটা স্কুল অফ মিউজিক'-এ। 'ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিক' সেইসময় সংগীতের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু সেখানে ভর্তি হতে না পেরে মিসেস গ্রীন হলের 'ক্যাবিনা দেলা মুজিকায়' ভর্তি হলেন। এ সময় তার মনের প্রবল ইচ্ছা ছিল তিনি একজন কনসার্ট পিয়ানিস্ট হবেন। কিন্তু বাদ সাধল তার হাতের আঙুলের গঠন। মিসেস গ্রীন হল জানালেন—

> *এত ছোট হাতে হবে না। কিছু কর্ড আছে, রিড আছে হাতের স্প্যানেই পাবে না। তাই কনসার্ট পিয়ানিস্ট হয়ে ওঠা আর হল না।* [১৩]

পিয়ানিস্ট হওয়ার স্বপ্ন ব্যর্থ হওয়ায় ইংরেজি থিয়েটার শুরু করলেন পুরোদমে। সংগীতের প্রতি প্রবল ভালোবাসার ফলে তিনি 'সিম্পনি' প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে থিয়েটারের সংলাপের পরে সংগীতের প্রয়োগই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তার কাছে।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় উৎপল দত্তের নানা গুণের ছটা বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সংগীত-আবৃত্তি-বিতর্কের পাশাপাশি অভিনয় কলা সমান্তরালভাবে চালিয়ে গিয়েছিলেন। একটা সময় তার উপলব্ধি হয় থিয়েটার নিয়েই তাকে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করতে হবে। সেকথা অকপটে স্বীকারও করেছেন—

> *সেন্ট জেভিয়ার্সে অভিনয়ের সময়েই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আমি থিয়েটারের লোক, থিয়েটারেই থাকব। সারা জীবন থিয়েটার করব।* [১৪]

সহপাঠীদের সঙ্গে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অভিনয় শুরু করলেন। এই সময় নাটকের প্রতি এতটাই নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে পড়লেন যে কলেজে নাটকের সীমিত অভিনয় সংখ্যা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারছিল না। তাই উৎপল দত্ত সংগত কারণেই বলেছিলেন—

> *কলেজি অভিনয়ে তৃপ্ত থাকাটা... আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।* [১৫]

১৯৪৭-এর জুন মাসে উৎপল দত্ত তার সহযোগী বন্ধু প্রতাপ রায় ও সেন্ট জেভিয়ার্সের অনেক ছাত্ররা মিলে গড়ে তুললেন 'দ্যা অ্যামেচার শেক্সপিরিয়ানস' নামে নাট্যদল। এটা 'লিট্‌ল্ থিয়েটার' গ্রুপের গোড়া পত্তন বলা যেতে পারে। যা প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজি দল হিসেবে এবং শেকসপিয়রের নাটক নিয়ে তার যাত্রা শুরু হয়। প্রথম অভিনয় হয় পূর্ণাঙ্গ নাটক 'রিচার্ড দ্যা থার্ড'

নামক নাটকটি। উৎপল দত্ত এই নাট্যদলের মূল ব্যক্তিত্ব, নাট্য নির্বাচনে, পরিচালনায় ও অভিনয়ে। এবারে এর-এর হয়ে নাটক অভিনয় করা নয়, একেবারে নিজের নাট্যদল তৈরি করে ফেললেন। এই নাট্যদলের প্রথম অভিনয় শেকসপিয়রের 'রোমিও এন্ড জুলিয়েট' সঙ্গে 'ম্যাকবেথ'। এই দলের পূর্ণাঙ্গ অভিনীত নাটক 'রিচার্ড দ্যা থার্ড'। 'রোমিও এন্ড জুলিয়েট' এর তিনটি দৃশ্য, 'ম্যাকবেথের' দুটি দৃশ্য অভিনীত হয়েছিল। নাটকগুলির কিছু অংশ অভিনীত হয়েছিল পূর্ণাঙ্গ নাটকের পরিচালনার দায়িত্ব গঠন এবং পরিচালক হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি লাভ। অভিনয় করার যেমন নেশা ছিল সেইসঙ্গে নাটক লেখার গভীর তাগিদ অনুভব করতেন। কলেজে পড়ার সময় কলেজ পত্রিকায় সেই তাগিদ থেকে 'বেটি বেল শাজার' নামক প্রথম ইংরেজি নাটক তিনি লিখেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন বিষয় নিয়েও তিনি লেখা শুরু করেন। যেমন— শেকসপিয়র, রাসেন, রুশ সাহিত্য প্রভৃতি। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও তার লেখা থেকে বঞ্চিত হতেন না। উৎপল মানসকে গভীরভাবে বোঝার জন্য ও পরবর্তীকালে নাটকে তাঁর প্রভাব কতখানি জানার জন্য কলেজ জীবনে তার লিখিত প্রবন্ধের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। উৎপল দত্তের মূলত প্রবন্ধ লেখার ঝোঁক ছিল। ছাত্র উৎপল দত্তের খুব কম লেখা আমরা পেয়েছি। স্কুল জীবনেরও তেমন কিছু লেখা পাওয়া যায়নি। তবে কলেজ জীবন থেকে তিনি মোটামুটি লেখা শুরু করেন। তার অনেকটাই পুনরুদ্ধার করা গেছে। কলেজ জীবন থেকে প্রবন্ধের প্রতি একটু বেশি তার ঝোঁক ছিল। নাটক লেখার ব্যাপারটা তার কাছে ছিল শখ মাত্র। কবিতা লেখা দূরের কথা কবিতা তিনি তেমনভাবে পছন্দ করতেন না। উপন্যাস ও ছোটোগল্প ইত্যাদির ছায়াও মাড়াননি। গল্প উপন্যাস কবিতার বদলে তিনি প্রাবন্ধিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। উপন্যাস না লিখলেও উপন্যাসের প্রতি তার একটা আলাদা ভালোবাসা ছিল। তার অধ্যয়ন ও যুক্তি-বুদ্ধি, তত্ত্বে-তথ্যে, বিচার-বিশ্লেষণে, যুক্তিকেই প্রধান করে তুলতে চেয়েছেন।

উৎপল দত্তকে নিয়ে গল্পের শেষ নেই। তিনি অভিনয়ের জন্য রোমান হরফে নিজের ইংরেজি সংলাপ লিখে রাখতেন। তিনি ছোটোবেলা থেকেই বাংলা বলায় ও লেখায় একটু অপরিপক্ক ছিলেন। তবে তিনি কলেজ জীবন থেকেই বাংলা ও ইংরেজিতে একইসঙ্গে প্রবন্ধ লিখে গেছেন। এমনকি তার বাংলা প্রবন্ধের বিষয় পাশ্চাত্য সংগীত পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং ইংরেজি প্রবন্ধের বিষয় হিসেবে বাংলা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছেন। উৎপল দত্তের লিখিত প্রবন্ধে বিষয়বস্তু হিসেবে বাস্তবতা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলা কিংবা রুশ সাহিত্যের বাস্তবতার সন্ধান করেছেন। তিনি সেই বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে কখনও রুশ সাহিত্যেরও অতি সাম্প্রতিক বিষয়কে অনুসরণ করেছেন। আবার সামন্ততান্ত্রিক বাস্তবতার সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন। কলেজ জীবন থেকে নাটক সংগীত ও বিতর্কের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হলেও উপন্যাসের প্রতি একটু বিশেষ দুর্বল

ছিলেন। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়াকালীন কোনো উপন্যাস না লিখলেও এই সময়ে তিনটি প্রবন্ধের বিষয় হিসেবে উপন্যাসকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি অনেকটা সময় উপন্যাস পড়েই কাটিয়ে দিতেন। সব মিলিয়ে মনে হতে পারে উপন্যাসের প্রতি তার একটা গোপন আত্মিক সম্পর্ক ছিল।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে কলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। উৎপল দত্ত প্রথম বর্ষে লিখে ফেললেন একখানি ইংরেজি প্রবন্ধ, যার নাম— 'A Glance At Modern Russian Literature', এটি উৎপল দত্তের প্রথম প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পত্রিকায় ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে। কলেজের পত্রিকায় ছাত্ররা মূলত ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা করতেন। তবে উৎপল দত্তের এই প্রবন্ধটি একেবারেই আলাদা। আধুনিক রুশ সাহিত্যের ওপর আলোচনা করলেন তিনি। এর আগে কেউ বোধহয় এই রাশিয়ান সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার সাহস দেখাননি।

উৎপল দত্ত রুশ সাহিত্যের উপন্যাসের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করলেন। এই প্রবন্ধটিতে সব মিলিয়ে তিনি ছয় জন লেখকের দশটি উপন্যাস-এর উল্লেখ করেছেন। রুশ সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত বই প্রায় তখন অমিল বলা যেতে পারে। খুব আগ্রহী ছাড়া ওইসব বইপত্র জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। উৎপল দত্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে খুঁজে খুঁজে বইগুলি পড়ে ছিলেন এবং তার ভিত্তিতেই তিনি আলোচনা করেছেন। ম্যাক্সিম গোর্কিকে সামনে রেখে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন উৎপল দত্ত। কারণ গোর্কির প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল আন্তরিক ও গভীর। এ কারণেই বোধহয় ম্যাক্সিম গোর্কি তার শিল্পী জীবনে প্রতিটা ক্ষেত্রে বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছেন।

রুশ সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষণবোধ করলেও তিনি বাংলা সাহিত্যকে কোনোভাবেই অবহেলা করেননি। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রথম বর্ষে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে কলেজ পত্রিকায় বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের বাস্তবতা নিয়ে একখানি প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। 'বাস্তবতা ও বাংলা সাহিত্য' এই প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে প্রমোদ চৌধুরী, রামকমল মুখোপাধ্যায়, বিপিন পাল-এরা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় সাহিত্যের বাস্তবতা নিয়ে যে বিতর্ক চালিয়েছিলেন তার সঙ্গে উৎপল দত্ত পরিচিত ছিলেন। বিষয়টি তার বোধহয় ভালো লাগেনি। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' আর 'গোরা' উপন্যাস তিনি বাস্তবধর্মী উপন্যাস হিসেবেই এদের স্বাদ গ্রহণ করেছেন। 'গোরা'

উপন্যাসে ধর্ম-সমাজ-রাজনীতি-বিতর্কের মধ্যেও বাস্তবতা খোঁজ করলেন। 'চোখের বালি'-তে নায়ক-নায়িকার অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র না দেখে অথবা 'গোরা' উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বস্তুহীন কল্পনা না দেখে বাস্তবের রাজ্যে এই দুটি উপন্যাসকে 'অমর উপন্যাস' বলেই স্বীকার করলেন। বাস্তবতার ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের সবচেয়ে কাছাকাছি ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে বাস্তবতার প্রতিমূর্তি ছাড়াও পেলেন বিদ্রোহ, পেলেন নিপীড়িত মানুষের জন্য অন্তহীন সহানুভূতি। তাঁর কাছে বাস্তবতার চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'বাস্তবতা ও বাংলা সাহিত্য' এই প্রবন্ধটিতে বাস্তবতার জমি পরিমাপ করার পর তিনি বাংলা সাহিত্যের তিনজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিককে নিয়ে তিনি লিখলেন "Three Bengali Novelist"। এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পত্রিকায়।

এই প্রবন্ধটি ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মনের পরিচয় নিতে বাস্তবতার প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও বৈভবের অনুপাতে তার বাস্তবতার স্বরূপ অনুধাবন করতে চেয়েছেন। শরৎচন্দ্র উৎপলের কাছে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। সামাজিক প্রথার অমানবিকতা আর প্রচলিত নীতিবোধের সংকট তাঁর উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। পল্লিসমাজ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শোষণ, নিপীড়ন, সমাজ পতিদের স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা তিনি দেখিয়েছেন, দেখেছেন এবং সমালোচনা করেছেন। নাগরিক আভিজাত্য আর উচ্ছৃঙ্খলতার বদলে সেখানে খুঁজে পেয়েছেন মানবতার মহৎ সৌন্দর্য। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা অত সক্রিয় নয়, তত বেশি ছলা-কলা জানে না। তারা সর্বংসহা অভিমানিনী। আঘাত না করে আহত হওয়াতেই তাদের গৌরব।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আগের প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করেননি। কারণ উৎপল দত্ত যে বাস্তবতার খোঁজ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে তার হদিস সম্ভব ছিল না। এই প্রবন্ধে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী সত্তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে চেয়েছেন।

এরপর তিনি লিখলেন সংগীতের প্রতি অনুরাগ ও গভীর ভালোবাসা থেকে 'সিম্ফোনি' প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পত্রিকায়। প্রবন্ধটি সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

১৯৪৮ সালের ইংরেজি একাডেমীর সম্পাদক ছিলেন উৎপল দত্ত। এই সময় তিনি একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যার নাম 'The Sceptcism of Bertand Russell'। প্রবন্ধটি লিখিত হয় ১৯৪৮ সালে। কিন্তু প্রবন্ধটি পাওয়া যায়নি ও কোথাও ছাপা হয়েছিল সেটাও জানা যায়নি। ১৯৪৮

সালের মার্চ মাসের ৬ তারিখে তিনি আর একটি প্রবন্ধ লিখলেন যার নাম 'Production Manifesto'। এখানে তিনি তার আবেগ, কৈশোরিক ভাব বিলাস, চিন্তা ও কিশোরকালীন ভাবাবেগ তাই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে উৎপল দত্ত লিখলেন এক্সিটেশন পোয়েট্রি। এটি প্রকাশিত হয়েছিল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পত্রিকায়। উৎপল দত্ত যখন কলেজে পড়তেন তখন কলেজ পত্রিকার আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য তৎকালীন পত্রিকার সহ-সম্পাদক একটা উপায় বের করলেন। যেমন কোনো খ্যাতনামা কবির অসমাপ্ত কবিতাকে আলাদা করে সমাপ্ত করলেন কলেজের কবিরা। মাঝে মাঝে কবিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে ছাত্রদের অনুভূতি অথবা সম্পাদকের মন্তব্য ছাপা হত। এরকম বিভিন্ন বিভিন্ন অনুভবে বহুরূপী সংকলন হল আলোচ্য এই প্রবন্ধটি। কলেজে পড়াকালীন উৎপল দত্তের একমাত্র নাটিকা রচনা করেছিলেন 'বেটি বেলসাজার'। এটি তার মৌলিক রচনা। এই নাটকটি তিনি ইংরেজিতে লিখতে চাননি। কলেজ পত্রিকার সম্পাদক পুরুষোত্তম লাল তাকে অনুরোধ করেছিল ইংরেজিতে লেখার জন্য, তার অনুরোধেই তিনি ইংরেজিতে লিখেছিলেন। কলেজ পত্রিকায় এই প্রথম নাটক ছাপা হয়েছিল এবং সেটি উৎপল দত্তের নাটক। নাটক লিখবার শখ তার বহুদিনের। যখনই সময় পেয়েছেন, নাটক লিখবার প্রচেষ্টা করেছেন। নাটক লিখতে তিনি যে কতখানি উৎসাহী ছিলেন সে বিষয়ে তার সহপাঠী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় অসাধারণ সাক্ষ্য দিয়েছেন—

> *কখনো কখনো ক্লাসের মধ্যে বসেই সে লম্বা একখানা খাতায় সদ্যোজাত নাটকের শিরোনামা অঙ্কিত করত, তার পিছনের বেঞ্চিতে বসে নিরাপদ দূরত্ব থেকে উঁকি দিয়ে দেখতাম— কোনোটার নাম 'The League of Bastrds' কোনোটার বা 'Betti Belshazzar'।* [১৬]

'বেটি বেলসাজার' নাটিকাটিতে দুটি দৃশ্য একটি প্রাচীন রাজাদের আমলের ও অন্যটি একেবারেই এখনকার ভোজসভাকে কেন্দ্র করে। দুই কালের ভোজসভাকে কেন্দ্র করে অভিজাত শ্রেণির জীবন দর্শনের ঐক্য ও জীবনচর্চার বিলাসিতা যে অভিন্ন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। সম্রাট বেলসাজার সর্ব শক্তিমান তিনি প্রতিবেশী দেশের থেকে বণিকদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধু বাছতে জানেন। দেশের নির্মম অত্যাচার আর বাইরের শত্রুর সঙ্গে লড়াই জিইয়ে রাখতে জানেন। তিনি লেনদেনের স্বার্থে বণিক চূড়ামণিদের ভোজসভায় আমন্ত্রণ করেন। ভোজ সভায় চলে ভোগ বিলাসিতা ও লাম্পট্য। 'বেলসাজার' নিজেকে ঈশ্বরের চেয়েও সর্বশক্তিমান মনে করেন। অন্যদিকে 'বেটি'ও তাই ভোগ বিলাসিতার চূড়ান্ত নিদর্শন। তার ভোজসভাতে বিভিন্ন চরিত্ররা ইন্দ্রিয় ভোগ ছাড়া বিশেষ কথাই বলেন না। সবকালের স্বৈরতন্ত্রী ও চাটুকার বণিকদের জমায়েত হয় 'বেটি' ও 'বেলসাজারের' ভোজসভায়।

১৯৪৯ সালের জুলাই মাসের ২৪ তারিখে শেকসপিয়রকে নিয়ে তিনি আর একটি প্রবন্ধ রচনা করলেন। যার নাম "Shakespeare and the Modern Stage"। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াকালীন উৎপল দত্তের একমাত্র এই প্রবন্ধটি কলেজ পত্রিকার বাইরে ছাপা হয়েছিল। উৎপল দত্তের কলেজে পড়ার পাঠ তখন প্রায় চুকে গেছে। কলেজের ছাত্র গোষ্ঠীর পরিষদ থেকে প্রাবন্ধিক উৎপল দত্ত হাজির হলেন তখনকার সবচেয়ে বিখ্যাত, অভিজ্ঞ সংবাদ পত্রের বিশাল পাঠকের দরবারে। এই প্রবন্ধে শেকসপিয়রকে নিয়ে তিনি সমকালের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই প্রবন্ধে আধুনিক মঞ্চে শেকসপিয়রের প্রযোজনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরলেন।

উৎপল দত্তের প্রতিভা এতটাই ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল যে শিল্প-সাহিত্যের যে অঙ্গনেই তিনি পদার্পণ করেছেন সেখানেই সফলতা অর্জন করেছেন। কলেজ জীবনে তার অধ্যাপক সহপাঠী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে—

সে একটা আবির্ভাব বললেই চলে...। [১৭]

পড়াশোনার দিক দিয়ে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। কলেজে বিভিন্ন নথিপত্র থেকে জানা যায়—

কলেজে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে সাম্মানিক ইংরেজিতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। [১৮]

কলেজের রেজাল্ট থেকে বোঝা যায় ইংরেজিতে কতটা তিনি দক্ষ ছিলেন ও ছাত্র হিসেবে কতটা মেধাবী ছিলেন। পড়াশোনার এইরকম অসাধারণ সাফল্য পাওয়া সত্ত্বেও পড়াশোনার প্রতি তিনি যে খুব মনোযোগী ছিলেন সেকথা বলা ঠিক হবে না। পাঠ্যপুস্তক, কলেজ বা পরীক্ষা এইসব বিষয় নিয়ে উৎপল দত্ত ভাবতেন 'কলেজ, লেক্‌চার, পরীক্ষা, পাঠ্যপুস্তক'— এসব হচ্ছে কলেজ জীবনের "বিরক্তিকর মায়া"।[১৯] আসলে এইসময় তিনি নাটকের প্রতি অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে পড়েছিলেন। অন্য কোনোকিছুই তাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারছিল না। এইসময় থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন "সারা জীবন থিয়েটার করব"।[২০] এইসময় কলকাতার পেশাদার নাট্যদলগুলির প্রযোজনা খুঁটিয়ে লক্ষ করতেন। যেখানে যখনই ভালো প্রযোজনা হত সেগুলো লক্ষ করতেন এবং সর্বদা শেখার চেষ্টা করতেন। তিনি বলেছেন—

বিশেষ করে, বড়বাবু, শিশির ভাদুড়ী মহাশয়ের অভিনয় দেখার সুযোগ পেলে ছাড়তাম না। নিবচ্ছিন্ন মনোযোগে তাঁর অভিনয় লক্ষ্য করতাম। সেই সব মহৎ কারবার দেখে মনে হল, আমার পক্ষে অভিনেতা ছাড়া আর কিছু হবার নেই। [২১]

এইরকম যখন তিনি ভাবছেন, তার মন যখন অভিনয় জগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছেন তখনই তাকে অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন জেফ্রি কেন্ডাল সাহেব তার নাট্যদলে।

গুরুলাভ : নিজের নবপ্রতিষ্ঠিত নাট্যদল 'দ্যা অ্যামেচার শেক্সপিয়রিয়ান্সের' হয়ে অভিনয় করতে করতে উৎপল দত্তের জীবনে একটা বড়ো সুযোগ এল। তার নিজের দলের তখন অভিনয় চলছে 'রিচার্ড দ্যা থার্ড' নাটকের। সেইসময় ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ পেশাদারি নাট্যদল 'দ্যা শেক্সপিয়রিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি' কলকাতায় অভিনয় করতে আসে। জগদ্‌বিখ্যাত এই পেশাদারি নাট্যদলের নাট্য প্রযোজক ছিলেন জিওফ্রে কেন্ডাল (Geoffrey Kendal)। তার শেকসপিয়র নাটকের অভিনয় জগৎজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

সেন্ট জেভিয়ার্সের যে মঞ্চ উৎপল দত্ত ও তার বন্ধুরা অভিনয় করছিলেন, কেন্ডাল ও তার নাট্যদল নিয়ে সেই মঞ্চেই উপস্থিত হন তাঁর দলের নাট্য প্রযোজনা করবেন বলে। কেন্ডাল তার নাটক অভিনয় করার জন্য, যথেষ্ট অভিনেতা না থাকার কারণে তিনি কিছু স্থানীয় অভিনেতা খোঁজ করেন। ঘটনা পরম্পরায় কেন্ডাল সাহেব তরুণ উৎপল দত্ত ও তার দলের অভিনয় দেখলেন এবং মুগ্ধ হলেন। উৎপল দত্তকে প্রস্তাব দিলেন যে তার দলের হয়ে অভিনয় করার জন্য ও তার দলে যোগ দেওয়ার জন্য। প্রস্তাবে উৎপল দত্ত রাজি হলেন এবং কেন্ডাল সাহেবের নাট্যদল 'শেক্সপিয়ারিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি'-তে যোগদান করলেন। কলকাতায় এই দলের প্রথম নাট্যাভিনয় শুরু হয় ৯ অক্টোবর ১৯৪৭ সালের 'ম্যাকবেথ' নাটক দিয়ে। প্রথম দফায় এখানে তাদের নাটক অভিনয় শেষ হয় ১০ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে। মাঝের এই দীর্ঘ ৯৪ দিন উৎপল দত্ত কেন্ডাল সাহেবের সাহচর্যে থেকেছেন ও নাটক সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছেন। ৯৪ দিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে উৎপল দত্ত লিখেছেন—

> *শিখতে লাগলাম বৈজ্ঞানিক মহলা কাকে বলে, অভিনয় বস্তুটা কী, মনোযোগ কতটা একাগ্র হওয়া চাই, একটি বাক্যের কত রকম কথনভঙ্গী হতে পারে। ... ১৯৪৮-এর জানুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত চলল শেক্সপিয়ারিয়ানার কলকাতা সীজন। লোক ভেঙে পড়েছিল দেখেতে। ... প্রতি হপ্তায় নতুন নাটক। সারাদিন পরে নাটকের মহলা, সন্ধ্যেবেলায় অভিনয়। এখানেই শিখলাম মেকআপ, কণ্ঠস্বরের ওঠানামার কৌশল, দেহের ব্যায়াম, তলোয়ার খেলা। তারচেয়েও যা বেশি, এখানে এল মনোভাবের বিরাট পরিবর্তন, থিয়েটার ও নাটক সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলে গেল।* [২২]

তারপর তারা ভারত ছেড়ে অন্যত্র অভিনয় করতে চলে যায় কিন্তু উৎপল দত্ত তার নিজের নাট্যদল নিয়ে এখানেই অভিনয় করতে থাকেন। কেন্ডাল সাহেবের পরামর্শ ও শিক্ষা তিনি অক্ষরে অক্ষরে

পালন করতে থাকেন। কেন্ডাল সাহেব তার দল নিয়ে দ্বিতীয় দফায় আর একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন অভিনয় করতে সময়টা ১৯৫৩-৫৪। উৎপল দত্ত আবার এই দলে যোগ দিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে আরও কয়েকটি নতুন নাটক উল্লেখযোগ্যভাবে অভিনয় করেন।

জেফ্রি কেন্ডালকে তার গুরু রূপে বরণ করেন উৎপল দত্ত। উৎপল দত্ত ও তার সহযোগীরা প্রথম প্রযোজনা করেন সেন্ট জেভিয়ার্স মঞ্চ ভাড়া নিয়ে শেকসপিয়রের 'রিচার্ড দ্যা থার্ড' নাটকটি। কিন্তু নাটকটির প্রযোজনা ও অভিনয় একেবারেই ভালো হয়নি। সেকথা তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। ''অত্যন্ত জঘন্য হয়েছিল।''[২৩] কিন্তু সেই প্রযোজনার পরে উৎপল দত্তের সঙ্গে এমন এক যোগাযোগ ঘটে যা উৎপল দত্তের শিল্পী জীবনের আমূল পরিবর্তনি ঘটে ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। শিল্পী হিসেবে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ ''সেদিন চলতি ভাষায় আমার গুরু লাভ হয়।''[২৪] কারণ সপরিবারে জেফ্রি কেন্ডাল সেই নাটক দেখতে এসেছিলেন। তিনি নাটক দেখলেন কিন্তু, প্রযোজনা এত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও এতটুকু বিরক্ত বোধ করলেন না অথবা নাট্য প্রযোজক ও নাট্যদলকে কোনোরকম কটুক্তি করলেন না। কেন্ডালদের নিজস্ব নাট্যদল ছিল। তারা ইংল্যান্ড থেকে ভারতসভায় এসেছিলেন। তখন উৎপল দত্ত কলেজি অভিনয়ের গণ্ডী পেরোতে চাইছেন, নিবিড়তম ও একনিষ্ঠভাবে নাট্যচর্চার জন্য নিজেদের নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলকাতার পেশাদার নাট্যশালার অভিনয় ও প্রযোজনাগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছিলেন আরও কিছু জানার, আরও কিছু শেখার জন্য। ঠিক তখনই এসেছিল তার জীবনের শুভক্ষণটি— ''তিনি আমাকে বললেন আমি ইচ্ছা করলে তাঁর দলে যোগদান করতে পারি।''[২৫] কেন্ডালের এই আমন্ত্রণ তার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল।

কেন্ডালকে গুরু রূপে গ্রহণ করলেন তার থিয়েটার শেক্সপিরিয়ানা-এর সুশৃঙ্খল জীবনযাপান বেছে নিলেন, যেখানে অভিনয় শুরু করলেন, কিন্তু নিজস্ব নাট্যদল 'দ্যা অ্যামেচার শেক্সপিয়রিয়ান্স'কে তুলে দেননি। বরং আরও একনিষ্ঠভাবে প্রবল আগ্রহে শেকসপিয়র, বার্নাড শ, শেরীদান, নোয়েল কাওয়াডের নাটকের অসামান্য উচ্চমানের প্রযোজনা করে গেছেন। এটা জানা গেছে যে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেকসপিয়রের 'টুয়েলভ নাইট' প্রযোজনার মধ্য দিয়ে 'দ্যি অ্যামেচার শেক্সপিয়ারিয়ান্সের' অবলুপ্তি ঘটে গিয়েছিল। ওই একই বছরে নভেম্বর মাসের ৬ তারিখে উৎপল দত্ত 'কিউব' নাট্য গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

জেফ্রি কেন্ডালের সঙ্গে এই দুই দফায় উৎপল দত্ত এই নাট্যদলের হয়ে বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। এগুলোর মধ্যে অবশ্যই শেকসপিয়র প্রধানতম, তাছাড়া ছিল বার্নাড শ, গোল্ড স্মিথ প্রমুখ নাট্যকারের নাটক। তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক ও চরিত্রাভিনয়

উল্লেখ করা যেতে পারে : 'ওথেলো' নাটকে (রোডোরিগো), মার্চেন্ট অফ ভেনিস' নাটকে (অ্যান্টোনিও), 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে (ব্রুটাস), 'ম্যাকবেথ' নাটকে (রস), 'গ্যাস লাইট' নাটকে (কসস্টেবল)।

এরমধ্যে কেন্ডালরা কলকাতা ছাড়ার পর ১৯৪৮ সালের ৪ জুলাই 'ওথেলো' নাটকের অভিনয়, কলকাতার পরিশীলিত সম্ভ্রান্ত সমাজে উৎপল দত্ত এক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছিল। 'ওথেলো' নাটকের সঙ্গে উৎপল দত্তের নাট্যদল পরপর যে নাটকগুলি অভিনয় করেছিল তার মধ্যে শেকসপিয়রের 'জুলিয়াস সিজার' অন্যতম। এই নাটকটি অভিনীত হয়েছিল অত্যাধুনিক পোশাকে। আধুনিক পোশাকে 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের ব্রুটার্স চরিত্রে অভিনয় করে উৎপল দত্ত কলকাতার মঞ্চে এক নতুন প্লাবন এনেছিলেন। ইংরেজি নাটক কলকাতা শহরে যতটা আলোড়ন তুলতে পারে তা এই নাটক তুলেছিল।

কেন্ডালের নাট্য দলের সঙ্গে অভিনয় ও ভ্রমণতাকে নাটকের অনেককিছু শেখাল। শেকসপিয়রকে আরও বুঝলেন। তার নাটকের বিশ্লেষণ করতে শিখলেন। বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নাট্য প্রয়োগের গভীরতা কতখানি হতে পারে তাও শিখলেন। নাট্য প্রযোজনায় পেশাদারি দক্ষতার প্রয়োজন কেন তা উপলব্ধি করলেন। ১৯৫৩-৫৪ কেন্ডাল সাহেব এক বছর ধরে ভারত সফর করেন। উৎপল দত্ত দ্বিতীয়বার এই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আরও বেশি উদ্যমে, একনিষ্ঠভাবে। কেন্ডাল সাহেবের কাজ একাগ্রচিত্তে অনুধাবন করেছেন। উৎপল দত্ত লিখেছেন—

> *অভিনয় করার জন্য তাদের যেতে হতো শহর থেকে শহরে— ট্রেনে, বাসে, লরিতে। আর গোটা চল্লিশেক বিরাট বিরাট বেতের তৈরি সিন্দুক-ভর্তি দলের পোষাক, পর্দা, সরঞ্জাম, আলো, ডিমার— সব বইতাম আমরা অভিনেতারাই। কুলি নিয়োগে কেন্ডালের ছিল জোর আপত্তি। মঞ্চ ধুয়ে মুছে কীভাবে মোমের পালিস করতে হয় তাও শিখেছিলাম।* [২৬]

এই থিয়েটার দলের সঙ্গে অভিনয় করে তিনি শিক্ষিত ও দীক্ষিত হয়েছিলেন থিয়েটারের শৃংঙ্খলায়, তার নিয়মানুবর্তিতা। এই থিয়েটার দল তাকে অনেক পরিণত অপরিপক্ক করে তুলেছিল। ধীরে ধীরে একজন নাটক অভিনেতা থেকে নাট্য প্রযোজক হিসেবে গড়ে উঠেছেন উৎপল দত্ত। শুধু অভিনয় নয় নাটক পরিচালনা নাট্য প্রযোজনা বিভিন্ন দিক, তার আলো, সংগীত, মঞ্চসজ্জা, সাজসজ্জা, কস্টিউমস, মেকআপ প্রভৃতি যে নাটকের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তা তিনি বুঝেছেন ধীরে ধীরে। আর এর সব ক্ষেত্রেই কেন্ডালের প্রভাব ছিল সর্বাগ্রে। উৎপল দত্ত পরবর্তী সময়ে স্বীকার করেছেন কেন্ডালে কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণ, বাক্‌ভঙ্গিও বচনের তীব্রতা তাকে প্রভাবিত করেছিল। একেবারে শিক্ষানবিশ-এর মতো হাতে কলমে শিখতে শিখতে উৎপল দত্ত পরিণত হয়েছেন নাট্য প্রযোজক,

পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে। তারপরে নাটক লেখায় হাত দিয়েছেন। নাট্যকার হয়ে উঠেছেন অনেকদিন পর উৎপল দত্ত তাঁর 'শেক্সপিয়ারের সমাজচেতনা' (১৯৭৩) গ্রন্থ রচনা করে তার নাট্যগুরু জেফ্রি কেন্ডালকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেছিলেন— 'You taught me what I know of Shakespeare'

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী উৎপল দত্ত কলেজ জীবন থেকে সংগীত, প্রবন্ধ, নাটক লেখার পাশাপাশি অভিনয় শিখলেন সমান্তরালভাবে। এখন আমরা দেখার চেষ্টা করব উৎপল দত্ত ছোটোবেলা থেকে তার কলেজি অভিনয় থেকে কীভাবে আস্তে আস্তে একজন খ্যাতনামা অভিনেতা হয়েছিলেন পাশাপাশি বিখ্যাত একজন পরিচালক হয়ে উঠেছিলেন তা আমরা দেখার চেষ্টা করেছিলেন। তবে সেখানে উৎপল দত্তের কী ভূমিকা ছিল তা বিশেষ জানা যায় না। তার উল্লেখযোগ্য অভিনয় বলতে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়বার সময়ই। একথা পূর্বেই আলোচিত। ফাদার উইভারের নির্দেশনায় সেখানে মূলত শেকসপিয়রের নাট্যচর্চাই বেশি হত। ফাদার উইভারের পরিচালনায় শেকসপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের তিনি প্রথম অভিনয় করেন ১৯৪৩ সালে। শেকসপিয়রের নাটকের চর্চা, তার নাটক পড়া, তার নাটকের অভিনয় দেখা, তার নাটকে অভিনয় করার মধ্য দিয়ে কিশোর উৎপল ধীরে ধীরে শেকসপিয়রের নাটক সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে থাকেন। তার আগ্রহ ক্রমশ বাড়তে থাকে। পরে এই ফাদার উইভারের পরিচালনায় উৎপল দত্ত আরও দুটি নাটকে অভিনয় করেছিলেন। একটি হল নিকোলাস গোগলের 'ডায়মন্ড কাট্স ডায়মন্ড' আরেকটি হল মলিয়রের 'দ্যা রোজারিজ স্ক্যাপিন'। প্রথমটা অভিনয় হয়েছিল ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে। দ্বিতীয়টি অভিনীত হয় দু'দফায়। ১৩ ও ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালে কলেজের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এবং ১৩ ও ১৫ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালের কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। দুটি নাটকই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের হলে অভিনীত হয়েছিল। প্রথম নাটকটিতে উৎপল দত্তের অভিনীত চরিত্রের নাম জানা যায় না। তবে দ্বিতীয় নাটকটির তিনি প্রধান চরিত্র স্ক্যাপিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। শুরু হল তার অভিনয় জগতে পথ চলা। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উৎপল দত্ত বলেছেন—

> *গগোল এর নাটকে প্রতাপ রায় এর অভিনয় খুবই উতরেছিল। মলিয়রের নাটকে অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং প্রতাপ রায় দুই বৃদ্ধের ভূমিকায় জমিয়ে অভিনয় করেছিলেন।* [২৭]

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এভাবেই উৎপল দত্তের নাটকের যথার্থ অভিনয়ের সূত্রপাত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে উৎপল দত্ত ও তার কয়েকজন কলেজের বন্ধুরা মিলে একটি নাট্যদল গড়ে তোলে ১৯৪৭ সালের জুন মাসে। যার নাম ''দ্যা অ্যামেচার শেক্সপিয়রিয়ান্স''। যা

থেকেই লিট্‌ল থিয়েটারের জন্ম হয়। এই নাট্যদলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অভিনয় 'তৃতীয় রিচার্ড'। যার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন উৎপল দত্ত নিজে। সেই তাঁর প্রথম প্রযোজনা। এরপর এই নাট্যদলের প্রযোজনায় এবং উৎপল দত্তের পরিচালনায় অভিনীত হয় 'ম্যাকবেথ' নাটক ৯ অক্টোবর ১৯৪৭ সালে অভিনীত হয় ''দ্যা মার্চেন্ট অফ ভেনিস।'' এই নাটকটি সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হয়েছিল। 'জুলিয়াস সিজার' অভিনীত হয়েছিল একই দিনে বা ১০-১০-১৯৪৭ তারিখে। 'ম্যাকবেথ' নাটকের দ্বিতীয় পর্বের অভিনয় হয়েছিল ১৩-১০-১৯৪৭ তারিখে। এটি নির্বাচিত হয়েছিল সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্রদের অভিনয়ের জন্য। 'ওথেলো' অভিনীত হয়েছিল ২৭-১০-১৯৪৭ তারিখে। 'গ্যাসলাইট' নাটকটি অভিনীত হয়েছিল ৩ নভেম্বর ১৯৪৭। এছাড়া আরও কিছু নাটক অভিনীত হয়েছিল সেন্ট জেভিয়ার্স মঞ্চে এবং উপরে আলোচ্য নাটকের পুনরাভিনয় হয়েছিল।

উৎপল দত্তের 'দ্যা মার্চেন্ট অফ ভেনিস' নাটকে অ্যান্টোনিও-এর ভূমিকায় অভিনয়ের দ্বারা তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু হয়। তারপর 'ম্যাকবেথ' নাটকের রস, 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে ডিসিয়াস, 'গ্যাসলাইট' নাটকে কনস্টেবল— প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করতে থাকেন। তিনি বলেছেন—

> *'দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস' নাটকে অ্যান্টোনিওর ভূমিকা দিয়েই তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। তারপর 'ম্যাকবেথে' রস, 'সীজারে' ডিসিয়াস, 'শিস্টুপস টু কংকার'-এ স্যার চার্লস, 'ওথেলো'য় রডেরিগো, 'গ্যাসলাইটে' এক কনস্টেবল, 'পিগম্যালিয়নে' এক পথচারী, কখনো বা কোনো নাটকের মৃত সৈনিক।* [২৮]

এভাবে অভিনয় করে তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে পরিণত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাটক পরিচালনার কাজটাও সমান্তরালভাবে করে গেছেন। একটু একটু করে শিখতে শিখতে একজন দক্ষ, সুযোগ্য, পেশাদার অভিনেতা ও পরিচালক হয়ে উঠেছিলেন।

উৎপল দত্ত সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ পর্যায়ে চার বছর তার প্রতিভাকে বিভিন্ন অঙ্গনে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন নথি তথ্য তালাশ করে দেখা যায় এই চার বছরে আবৃত্তি, বিতর্ক, রাজনীতি চর্চার সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধও লিখে গেছেন। একটি নাটিকা রচনা করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ছয়টি প্রবন্ধ লিখেছেন, সিনেমা দেখেছেন প্রচুর। অভিনয় করেছেন অন্তত তেরোটি নাটকে। জগৎ জোড়া বিখ্যাত পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তাদের কাছ থেকে সুমূল্য পরামর্শ যেমন পেয়েছেন, তেমনি তাদের নাট্যপরিচালনার কৌশল, নাট্য সম্পর্কিত সমস্ত কাজকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে ও নিবিড়ভাবে দেখেছেন। তাঁর অভিনীত ও পরিচালিত নাট্যকারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শেকসপিয়র। এছাড়াও গগোল, বার্নাড শ, মলিয়ের, গোল্ডস্মিথ প্রমুখ বিখ্যাত

নাট্যকারদের নাটকেও কমবেশি অভিনয় করেছেন, পরিচালনাও করেছেন। এসময় তিনি একজন শিল্পী মাত্র মূলত এসময় তিনি জ্ঞান আরোহণ করেছেন। যেখানে যা পেয়েছেন দুই হাত দিয়ে কুড়িয়েছেন। নিজের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। এসময় তাঁকে 'শেক্সপিয়ার থিয়েটারওয়ালা' বললেও অত্যুক্তি হয় না।

গণনাট্য সংঘ পর্ব :

আগেই আলোচনা হয়েছে উৎপল দত্ত কলেজে পড়ার সময়ে তিনি ও তার বন্ধুরা মিলে একটি নাট্যদল গড়ে তোলেন, সেটাই পরবর্তীকালে 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ' হয়। উৎপল দত্ত ও তার বন্ধুরা মিলে যে নাট্যদল গড়ে তোলেন তার নাম ছিল 'দি অ্যামেচার শেক্সপিয়ারিয়ানস্।' এই দলের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে। দু'বছর ইংরাজিতে শেকসপিয়ারের নাটক অভিনীত হত এই গ্রুপের দ্বারা। দু'বছর একটানা শেকসপিয়রের নাটক অভিনয় করার পর ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে এই দলের নাম হয় 'কিউব'। এই দ্বিতীয় দলটিও মূলত ইংরেজিতে নাটক অভিনয় করছিল। এই কিউব ১৯৪৯ সালের শেষভাগে রূপান্তরিত হয় 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপে' অর্থাৎ উৎপল দত্তের কলেজ ছাড়ার পরে। এই নাট্যদলের নাম হোক লিটল থিয়েটার গ্রুপ এই প্রস্তাব করেছিলেন দিলীপ রায় যিনি কিউব প্রযোজিত 'ডিস্টিংগুইজড্ গ্যাদারিং' নাট্য প্রযোজনা সংগঠক ছিলেন। 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের' বাংলা শাখার প্রথম সম্পাদক ছিলেন রবি সেনগুপ্ত।

উৎপল দত্ত কলেজ ছাড়ার পর থেকে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের প্রযোজনা হিসেবে নাটকের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই পর্বে উৎপল দত্ত একনিষ্ঠভাবে মার্কসবাদ অধ্যায়ন করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এই লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপে ও সেই সময় একাধিক সদস্য ছিলেন যারা রাজনৈতিকভাবে বামপন্থী। সেই সময় স্মৃতিচারণ করেন উৎপল দত্ত বলেছেন—

> *আমাদের গ্রুপের মধ্যেই আসছিল বামপন্থী ধ্যান-ধারণা, ভাবনা।... ভারতেও তখন প্রচণ্ডভাবে বামপন্থী ধ্যান ধারণার প্রবাহ। দেশ সবে মাত্র স্বাধীন হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা জাগ্রত ছিল মানুষের মধ্যে। সেটা থিয়েটার গ্রুপের মধ্যে সংক্রামিত হতে বাধ্য।* [২৯]

উৎপল দত্ত ও সদ্য প্রতিষ্ঠিত লিট্‌ল থিয়েটারের অন্যান্য সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দুটি বিপ্লবী নাটক প্রযোজনা করেন একটি হল 'ক্লিফোর্ড ওডেটস'-এর বিপ্লবী নাটক 'ওয়েটিং ফর লেফটি'এবং 'ওডেটস'-এর অপর আরেকটি নাটক যেটি কমিউনিস্ট পার্টির আমৃত্য সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে রচিত 'টিল দ্যা ডে আই ডাই।' এই নাটক দুটির প্রযোজনা করার কারণ হিসেবে উৎপল দত্ত বলেন—

১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি হল। গ্রেপ্তার গুণ্ডামি চলল বেপরোয়া। ... শেক্সপিয়ারে বা বার্নাড শ-এ আটকে থাকাটা তখন অসহ্য লাগছিল। কারাগারে গুলি চালানোর সংবাদের ক্রোধ যেন ব্যর্থ নিঃশ্বাস হয়ে ধাক্কা মারছিল বক্ষ পঞ্জরে। [৩০]

এসবের প্রতিবাদে ও কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামের কাহিনি জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য ও তাদের জানানোর জন্য এই বিপ্লবী নাটক দুটি প্রযোজনা করেন ও তার সহকর্মীরা।

উৎপল দত্ত 'গণনাট্য সংঘ' যোগদান করেন ১৯৫০ সালে। লিট্‌ল থিয়েটারে এইসময় যে নাটকগুলো হত সবই ইংরাজিতে। হলে তাদের ইংরাজি থিয়েটারের দর্শক সংখ্যা দ্রুত কমে আসছিল, কিছু ইংরেজি দর্শক বাদ দিয়ে। উৎপল দত্তের মনে হয়েছিল কিছু ইংরেজি জানা দর্শকদের সামনে নাটক করে যাওয়া নিরর্থক। তাই তিনি চাইছিলেন বাংলায় নাটক করতে, যাতে আরও অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় কারণ বাংলার বেশিরভাগ দর্শক ছিল বাংলা নাটকের। গণনাট্য সংঘ উৎপল দত্তকে বাংলায় নাটক করার সেই সুযোগ করে দিয়েছিল।

তারপরেই প্রধানত সলিল চৌধুরীর মধ্যস্থতায় এবং গণনাট্য সম্পাদক নিরঞ্জন স্যারের আগ্রহে— আমি 'লিটল থিয়েটার' থেকে ছুটি নিয়ে গণনাট্যে সঙ্গে যোগ দিই। [৩১]

উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘের যোগ দেওয়ার আগে চরম মানসিক অশান্তির মধ্য ছিলেন। কলকাতায় শেকসপিয়র, বার্নাড শ, ওডেটস-এর নাটকগুলো ইংরেজিতে অভিনয় করা তার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছিল। এইসব ইংরেজি নাটক অভিনয় করে তিনি বৃহত্তর জনসাধারণের থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছিলেন। এইরকম মানসিক অস্থিরতা ও বিপর্যস্ততা থেকে কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং নিজের আত্মপরিচয়ের অন্বেষণে তিনি গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র নাটকের দর্শক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য, নিজের এই অস্থিরতা এবং জনতার থেকে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য এই সময় তিনি মার্কসবাদ অত্যন্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন।

উৎপল দত্ত নিজের মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যেমন গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়েছিলেন তেমনি অপরদিকে উৎপল দত্তকেও গণনাট্য সংঘের প্রয়োজন ছিল। গণনাট্য সংঘ ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি হয় ও তাদের ফ্রন্টে ভাঙন ধরে। নেতা কর্মী শিল্পীরা পুলিশি অত্যাচার-নির্যাতনে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আবার ১৯৫০ সালে পার্টির ওপর থেকে যখন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় তখন গণনাট্য সংঘকে পুনরায় সংগঠিত করার প্রচেষ্টা শুধু হয়। পার্টির বাইরে থেকে যোগ্য শিল্পীদের নিয়ে এসে গণনাট্য

সংঘকে পুনর্গঠনের একটা প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। তারা মনে করেছিল উৎপল দত্তের মতো শিল্পীকে গণনাট্য সংঘে নিয়ে আসা খুবই প্রয়োজন। তাই তারা উৎপল দত্তকে গণনাট্য সংঘে আমন্ত্রণ করেছিল 'গণনাট্য সংঘকে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টায়। সাক্ষাৎকারে উৎপল জানিয়েছেন—

> *তখন আই.পি.টি.এ পুনর্গঠন-এর চেষ্টা হচ্ছে ১৯৪৮ পার্টি বেআইনি হওয়ার পরে পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ... তারপরে এই সময়টা— ৫১/৫২ তে Party reorganize করেছিল তার cultural front। তখন তারা বাইরে থেকেও শিল্পীদের ডাকছিল— আপনারা আসুন। আমাদের সাহায্য করুন reorganize করতে। এই আবেদন নিয়ে সলিল চৌধুরী আমার সঙ্গে দেখা করেন...। তখন আমি যোগদান করি।* [৩২]

গণনাট্য সংঘের তৎকালীন সম্পাদক নিরঞ্জন সেন মহাশয় উৎপল দত্তকে গণনাট্য অভিনয় ও পরিচালনার কাজ করতে অনুরোধ করেন। উৎপল দত্ত সে আবেদন গ্রহণ করেন এবং তিনি ছন্নছাড়া ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া গণনাট্য সংঘের কর্মীদের সংগঠিত করার জন্য উৎপল দত্ত প্রযোজনা করেন কমিউনিস্ট পার্টির আমৃত্যু সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে রচিত বিপ্লবী নাটক 'টিল দ্যা ডে আই ডাই'।

> *টিল দ্যা ডে আই ডাই' নাটকের প্রযোজনা কমিউনিস্ট মহলের অনেকেরই ভালো লেগেছিল।* [৩৩]

গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়ে তিনি প্রথম অভিনয় করেন পানু পালের 'ভাঙা বন্দর' নাটক। এরপরে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটকটি পরিচালনা করেন। গণনাট্য সংঘ-এর নাটক প্রযোজনা করে উৎপল দত্তের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর হয়নি। 'বিসর্জন' নাটকে সব নামিদামি শিল্পীরা অভিনয় করেছিলেন কিন্তু এত শিল্পী সমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও নাটকটি প্রযোজক উৎপল দত্তের একেবারে মনঃপুত হয়নি, নামিদামি শিল্পী সমাবেশ সত্ত্বেও না ছিল কারো মধ্যে শৃঙ্খলা না ছিল কারো মধ্যে পেশাদারি দক্ষতা পার্টির প্রচার কার্যে সদস্যদের যতটা নিষ্ঠা ও উৎসাহ ছিল শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। উৎপল দত্তের মতে—

> *কদর্য প্রযোজনা। ...কেউ প্রমটার দাবী করছেন, কেউ নির্দেশের বাইরে প্রবল হাত ছুঁড়ছেন। কেউ বা দেরীতে এসে সোজা বলছেন পার্টি মিটিং ছিল, কী করবো?— ইত্যাকার সব বিশৃঙ্খলা।* [৩৪]

অন্যদিকে উৎপল দত্ত গোড়া থেকেই ছিলেন পেশাদারি শৃঙ্খলাবোধে অভ্যস্ত, পেশাদারি দক্ষতায় আস্থাবান। তাই উৎপল দত্তকে নাটক পরিচালনার ক্ষেত্রে 'গণনাট্য সংঘ'-এর শিল্পীদের বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল, শিল্পীদের স্বেচ্ছাচারিতাকে সংযত করতে হয়েছিল। সবার মধ্যে অন্তত

শৃঙ্খলাটুকু প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তিনি এবং করেও ছিলেন। তার কথায়—

> *'অফিসার', গোগলের 'রেভিব্যর', ঋত্বিক-কৃত বাংলা রূপ। এর মহলায় ক্রমশ আমরা একটি সুসংহত টিম হয়ে উঠি, প্রবল শৃঙ্খলায় নিজেদের বাঁধি এবং তারপর অসংখ্য অভিনয় করতে থাকি গ্রামে-গঞ্জে।* [৩৫]

গণনাট্য সংঘ যোগ দেওয়ার আগে উৎপল দত্ত যে মানসিক অস্থিরতা ও টানাপোড়েনের মধ্যে ছিলেন গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়ে সেই টানাপোড়েন সব অবসান হল এমন নয়, উৎপল দত্ত একদিকে যেমন জন বিচ্ছিন্ন থেকে মুক্ত হচ্ছেন গণসংযোগ দিয়ে, তেমনি নতুন নতুন সদস্য, নতুন অন্তর্দ্বন্দ্ব ভিন্ন টানাপোড়েনের মুখোমুখি হচ্ছিলেন। সহকর্মীরা তার বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ করতে থাকে, তাকে নানা দোষে দোষী বানাতে থাকে। ফলে 'গণনাট্য সংঘে' তার বেশিদিন কাজ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তার কথায়—

> *গণনাট্যতে আমি বেশীদিন থাকিনি বা থাকতে পারিনি— মোটে দশ মাস।* [৩৬]

উৎপল দত্তের আঘাত ও যন্ত্রণার জায়গাটা ছিল যে 'গণনাট্য সংঘে'র যে নেতাকর্মীদের জন্য তিনি প্রাণপণ কাজ করার চেষ্টা করতেন সেই নেতাকর্মীদের মধ্যে কতিপয় নেতা কর্মীরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন। তাদের অভিযোগগুলো ছিল প্রথমত, উৎপল দত্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করেন। তিনি একজন স্মোকার তিনি 'গননাট্য সংঘের' এ রীতিনীতি সঠিকভাবে মানেন না ও পালন করেন না— সুতরাং তিনি 'গণনাট্য সংঘে' থাকার অনুপযুক্ত। দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল উৎপল দত্ত ক্যারিয়ারিস্ট। নিজের ক্যারিয়ার ছাড়া অন্য কিছু বোঝেন না। তিনি গণনাট্য সংঘকে ব্যবহার করেছেন নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য ও অভিনেতা হিসেবে নিজের ক্যারিয়ারকে আরও উজ্জ্বল ও সুগম করার জন্য। এরকম স্বার্থসর্বস্ব লেখক 'গণনাট্য সংঘে' থাকার অনুপযুক্ত। এসব অভিযোগ শুনে উৎপল দত্ত অবাক ও বিস্মিত হয়েছেন। তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন—

> *এরকম কিছু নেতা গণ নাট্যের সমূহ ক্ষতি করছেন। তারা গাইতে জানতেন না, নাচতেও না, অভিনয় করতেন না, লিখতেনও না। মনে হয় যারা গাইতো, নাচতো, অভিনয় করতো, লিখতো— তাদের তাঁরা তেমন সইতে পারতেন না। ... নিজের আখের গোছাবার জন্য কেউ যে পথনাটিকায় অভিনয় করতে যায় এটা জানতাম না।* [৩৭]

তৃতীয় অভিযোগটি ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মারাত্মক। 'গণনাট্য সংঘে'র একাংশ অভিযোগ করলেন— উৎপল দত্ত মার্কসবাদী নন, তিনি স্তালিন বিরোধী অর্থাৎ ট্রটস্কি পন্থী। উৎপল দত্ত আজীবন ধরে মার্কসবাদ বিশ্বাস করে গেছেন, কমিউনিস্ট পার্টিকে ভালোবেসে গেছেন, তার

বিরুদ্ধে এরকম একটা অভিযোগ তিনি মানতে পারেননি। তার বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ করা হয়েছিল কারণ, পড়াশোনার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁকের কারণে তিনি সব বই পড়তেন যেমন ট্রটস্কি পড়তেন তেমনি স্ট্যালিন ও পড়তেন। কিন্তু তখন কারো হাতে ট্রটস্কির বই দেখা মানে ভয়াবহ একটা ব্যাপার ছিল। তখন স্তালিন জিন্দাবাদ ছাড়া কিছুই বলা যেত না। ভয়ানক অবস্থা ছিল। কমিউনিস্টদের সামনে ট্রটস্কি নামও উচ্চারণ করা বারণ আছে। এটা উৎপল দত্তের কাছে অসহনীয় ছিল। সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত জানান—

> *আমি কিন্তু ট্রট্স্কিবাদী নই, আমি মনে করি, আমি প্রকৃত স্তালিনবাদী, কেননা আমি ট্রট্স্কি পড়ে বুঝেছি যে সেটা কেন ভুল আর স্তালিন কেন সঠিক...।* [৩৮]

'গণনাট্য সংঘের' একটা অংশ উৎপল দত্তের গায় ট্রটস্কিবাদী লেবেল লাগিয়ে তাকে কোণঠাসা করার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এইভাবেই উৎপল দত্তের চিন্তা ও কাজের সঙ্গে গণনাট্য নেতৃত্বের সংঘাত বেঁধেছিল প্রতিক্ষণে প্রতি পদে পদে। 'গণনাট সংঘ' উৎপল দত্তকে রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করেছিল। অবশেষে একদিন 'গণনাট্য সংঘের' নেতাদের তরফ থেকে তাকে সরাসরি চলে যেতে বলা হল এবং বলা হল তিনি যেন 'গণনাট্য সংঘের' সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখেন। উৎপল দত্ত 'গণনাট্য সংঘ' থেকে এভাবেই বিতাড়িত হলেন।

লিটল থিয়েটার পর্ব :

গণনাট্য সংঘের সঙ্গে উৎপল দত্ত পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, এরপর তিনি ফিরে এলেন 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' ১৯৫১ সালে। এইসময় 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এ উৎপল দত্ত প্রধানত 'ধ্রুপদী' নাট্যচর্চা করতেন। এই 'ধ্রুপদী' নাট্যচর্চা ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত বজায় ছিল। গিরিশচন্দ্র-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-এর নাটক যেমন চলত তেমনি শেকসপিয়র-ইবসেন-গোর্কি প্রভৃতি নাট্যকারের নাটকের বঙ্গানুবাদগুলি তখন মঞ্চস্থ করে যাচ্ছিল উৎপল দত্তের থিয়েটার। স্মৃতিচারণে তিনি বলেছেন—

> *পুরাতন ক্লাসিককে মঞ্চে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা আমরা প্রয়োজনীয় মনে করেছিলাম... বাংলা নাটকের ঐতিহ্যের সঙ্গে আগে গভীরভাবে যুক্ত না হলে নূতন ঐতিহ্যের দিকে এক কদমও এগোনো যায় না, এটাও আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতাম।* [৩৯]

'ধ্রুপদী' নাট্যচর্চার পাশাপাশি পথনাটকের ঐতিহ্য তারা বজায় রেখেছিলেন। গণনাট্যে থাকাকালীন পথনাটকের সম্পর্কে যে শিক্ষা উৎপল দত্ত লাভ করেছিলেন, সেই শিক্ষার প্রতিফলন হচ্ছিল এই

সময়। পঞ্চাশের দশকের রাজনৈতিক চেতনা ও সমকালীন সমাজ দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হচ্ছিল ও প্রকাশিত হচ্ছিল মূলত পথনাটকের মধ্য দিয়ে। এইসময় পথনাটিকা সফলতার সঙ্গে তারা অভিনয় করে চলেছিলেন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। উৎপল দত্ত বলেন—

পাশাপাশি বজায় রেখেছিলাম পথনাটিকার ঐতিহ্য। [৪০]

পথনাটকের পাশাপাশি এই সময়ে মঞ্চনাটকেও তারা অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছিলেন। 'ধ্রুপদী' নাটকগুলো এতটাই জনপ্রিয় হচ্ছিল যে তাদের সপ্তাহে তিন-চারদিন করে অভিনয় করতে হচ্ছিল। বেশিরভাগ অভিনয় হচ্ছিল কলকাতার বাইরে। এরকম পরিস্থিতিতে যখন অভিনয়ের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে তখন তারা মনস্থির করল 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এর নিজস্ব একটা থিয়েটার প্রয়োজন। উৎপল দত্ত জানান—

শো-এর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পরেই আমাদের তখন মাথায় চেতনাটা জন্মালো, তাহলে নিজেজের থিয়েটার দরকার। তখন থিয়েটার খুঁজতে লাগলাম আমরা অ্যাকটিভ্‌লি। কেউ যদি আমাদেরকে কোথাও কোনও থিয়েটার দেয়! থিয়েটার তো পাওয়া যেত না! ... তারপর অজিত গাঙ্গুলী নাট্যকার— তিনি এসে মিনার্ভার ব্যবস্থাটা করে দিলেন। কেননা থিয়েটারের মালিক ওঁর পরিচিত ছিল। তখন আমরা মিনার্ভা নিলাম। [৪১]

১৯৫১ সালে জুন মাসে উৎপল দত্ত ও তার 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এর সহকর্মীরা মিনার্ভা থিয়েটার লীজ নেয়। নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায় যোগাযোগ করিয়ে দেয় মালিকের সঙ্গে। প্রথমত মালিক লীজ দিতে রাজি না হলেও পরবর্তী সময়ে রাজি হয়ে যান। 'মিনার্ভা' থিয়েটার লীজ নেওয়ার আগে 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' চরম আর্থিক সংকট ও দুর্দশার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। 'মিনার্ভা থিয়েটার' তারা ভাড়া নেয় এই আশা করে যাতে এখান থেকে তারা কিছুটা লাভের মুখ দেখতে পারে। কিন্তু লাভের পরিবর্তে লোকসান বেশি হতে শুরু করল। 'মিনার্ভা থিয়েটার' ভাড়া নেওয়ার আগে যে পরিমাণ তাদের লোকসান হচ্ছিল, 'মিনার্ভা থিয়েটার' ভাড়া নেওয়ার পরে তাদের লোকসান বরং আরও বেড়ে গেল। স্মৃতিচারণায় উৎপল দত্ত বলেছেন—

মিনার্ভা থিয়েটারে 'লিটল্ থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই অভাব-অনটন কমার পরিবর্তে বেড়ে গেল দ্বিগুণ। [৪২]

তবুও তারা চরম সংকটের মধ্যেও অভিনয় চালিয়ে গেছেন, গ্রুপকে সফল-সচল রেখেছেন। কারণ মঞ্চেতে বিপ্লবের কথা বলতে হবে, তার জন্য তারা অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। আর এই সংকল্প নিয়েই অনেক সদস্য অনেক আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। যেমন—

শোভা সেন তার বাড়ি বন্ধক রেখে টাকা এনে দিলো অকাতরে। পরেও বারবার শোভা এবং তাপস সেন নিজ নমে হুণ্ডি কেটে টাকা এনে সংকট রুখেছে। লিটল থিয়েটারের সদস্যরা কখনো বা যে যতটুকু পেরেছে টাকা দিয়েছে। [৪৩]

এইভাবে প্রবল অর্থকষ্টের মধ্য দিয়েও শুধু আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসা, দায়বদ্ধতাকে সম্বল করে তারা 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' 'মিনার্ভা থিয়েটারে নাট্য অভিনয় শুরু করল ১৯৫৯ সালে। চরম সংকটের মধ্যেও তারা পিছিয়ে আসেনি বরং শক্ত হাতে তা মোকাবিলা করেছেন। এভাবেই আরম্ভ হল বাংলা থিয়েটারের এক ঐতিহাসিক অধ্যায়।

মিনার্ভা থিয়েটার লীজ নেওয়ার পর উৎপল দত্ত চিন্তাভাবনা শুরু করলেন কীভাবে আধুনিক রাজনৈতিক নাটক মঞ্চস্থ করা যায়। যদিও পথনাটকের বিষয়বস্তু রাজনৈতিক ছিল কিন্তু তার সঙ্গে অনেক তফাত, তার ক্ষেত্র আলাদা নির্মাণ পদ্ধতি আলাদা তার উদ্দেশ্য আলাদা। মঞ্চের জন্য তিনি আধুনিক রাজনৈতিক নাটক-এর খোঁজ চালাচ্ছিলেন। তিনি সেইসব রাজনৈতিক নাটক খুঁজছিলেন যেসব নাটক আমাদের দেশের মানুষ সহজে বুঝতে পারবেন, যার আঙ্গিকে দেশের মানুষের কাছে অপরিচিত মনে হবে না, যার বিষয়বস্তু ঘটনা দেশের মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যাবে। অনেক প্রচেষ্টার পর ব্যর্থ হলেন। তিনি বলেছেন—

অনেক খুঁজেও আমরা যে-নাটক চাই তা পাইনি, তাই নিজে নাটক লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। [৪৪]

মঞ্চে অভিনয় করার জন্য নাটক প্রয়োজন, সেই তাগিদে এবং শোভা সেন-এর প্রেরণা ও পরামর্শ মতো তিনি প্রথম মৌলিক নাটক লেখেন 'ছায়ানট'। প্রধানত তার মৌলিক নাটক শোভা সেন-এর ঘটনা ও নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণা ও উৎসাহের ফল—

ভবিষ্যতে বৈপ্লবিক কিছু করতে গেলে আগে সহজ কিছুতে হাত পাকানো উচিত— এরকম একটা আইডিয়া মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল শোভা। [৪৫]

উৎপল দত্ত চিন্তাভাবনা করলেন শ্রমিক আন্দোলনকে আনতে হবে পেশাদার নাট্যশালায়। তার মতে বাংলার পেশাদার নাট্যশালায় তখনো পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণি আসেনি। বাংলা শ্রমিককে অচ্যুত করে রাখা হয়েছিল পেশাদার থিয়েটারে এমনকি গণনাট্য সংঘের নাটকগুলো ছিল—

কিছু চাষীর কান্না বা মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাপের মধ্যে। [৪৬]

তাই তিনি শ্রমিক শ্রেণিকে পেশাদার থিয়েটারে আনার প্রচেষ্টা করলেন তিনি কয়লা খনির শ্রমিক আন্দোলন ও তাদের সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে লিখলেন 'অঙ্গার' নাটক। উৎপল দত্ত 'অঙ্গার' নাটকে তুলে ধরলেন শ্রমিক শ্রেণিকে এরপর রচনা করলেন 'ফেরারী ফৌজ' সেখানে দেখা গেল বিপ্লবীদের কার্যকলাপ। তারপর রচনা করলেন বিখ্যাত নৌ-বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে কল্লোল নাটক। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল উৎপল দত্তের দৃষ্টিভঙ্গি একটি সুনির্দিষ্ট অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে এবং সে অভিমুখ হল রাজনৈতিক অভিমুখ। এরপর উৎপল দত্ত লেখেন একের পর এক বিখ্যাত রাজনৈতিক নাটক— 'অজেয় ভিয়েতনাম', 'তীর', 'মানুষের অধিকারে', 'যুদ্ধং দেহী' প্রভৃতি বিখ্যাত রাজনৈতিক নাটকসমূহ।

১৯৬৭-৬৮ সালে উৎপল দত্তের জীবন চলছিল এক জন বিচ্ছিন্নতা পর্ব। এ সময় দাঁড়িয়ে উৎপল দত্ত বুঝতে পারছিলেন তার স্বপ্নের 'লিটল থিয়েটার' ভেঙে পড়তে চলেছে, অন্যদিকে 'মিনার্ভা' থিয়েটারকেও বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব নয় তাকে ছেড়ে দিতে হবে। তার থিয়েটার ক্রমশ গণআন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, জনসাধারণের জীবন ধারার সঙ্গে সংযোগহীন হয়ে পড়ছে। ১৯৬৯ সালে উৎপল দত্তের জীবনে শুরু হল ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। উৎপল দত্ত বুঝতে পেরেছিলেন 'লিটল থিয়েটার গ্রুপের' সদস্য থাকাকালীন পুনরায় জনসংযোগ করার জন্য তিনি এবং গ্রুপের ৯ জন বিশ্বস্ত সদস্য মিলে 'বিবেক নাট্য সমাজ' নাম দিয়ে আরেকটি দল গঠন করে ফেলেন এবং এই দলের মাধ্যমে যাত্রার কাজ শুরু করে দেন। এক সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত বলেছেন—

> *আমরা বুঝতে পেরেছিলাম লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ টিকবে না। ওরা টিকতে দেবে না। ওরা চায় না লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ থাকুক। কিন্তু আমাদেরকে তো নাট্য-আন্দোলন করে যেতেই হবে। অভিনয় ক'রেই যেতে হবে। তো লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ উঠে গেলে আমরা তখন কী করব?... তখন লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের সদস্য থাকাকালীনই আমরা 'বিবেক নাট্য সমাজ' শুরু ক'রে দিই।* [৪৭]

'লিট্‌ল থিয়েটারের' পাশাপাশি ১৯৬৯ সাল থেকে 'বিবেক নাট্য সমাজ' শুরু হল। অচিরেই উৎপল দত্ত-এর 'রাইফেল' নাটকটি 'বিবেক নাট্য সমাজ' নিয়ে যাত্রার কাজ শুরু করে দিল। 'লিটল থিয়েটার' ভাঙনের সময় উৎপল দত্ত যে জনবিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি হয়েছিল তা অনেকটা অতিক্রম করার সুযোগ পেয়েছিলেন এই যাত্রার মধ্য দিয়ে। যাত্রার মধ্য দিয়েই শিল্পী হিসেবে তিনি হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে বাস্তবিক যোগাযোগ রক্ষা করতে পেরেছিলেন। 'রাইফেল' যাত্রাপালা হিসেবে এত বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে উৎপল দত্ত ১৯৬৯ সাল থেকে নাটক

লেখার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে প্রতিবছর একটি করে নতুন যাত্রাপালা লিখতে শুরু করেন। এরপর নানা যাত্রা কোম্পানি উৎপল দত্তের লেখাগুলি নিয়ে অভিনয় করতে শুরু করল, পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন উৎপল দত্ত নিজেই, ফলে স্বাভাবিকভাবেই 'বিবেক নাট্য সমাজের কাজ অনেক কমে গেল। ১৯৭১ সালে 'বিবেক নাট্য সমাজ' নাম পালটে রূপান্তরিত হল 'পিপ্‌ল্‌স্ লিটল থিয়েটার'-এ।

> *কিন্তু তারপর যখন 'লিট্‌ল থিয়েটার' গ্রুপ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে, ওরা মিনার্ভা থেকে চলে গেল, মিনার্ভা শ্রমিকদের হাতে চলে এল...তখন আমরা পিপ্‌ল্‌স্ লিট্‌ল থিয়েটার নাম নিলাম। লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের উত্তরাধিকার হিসাবে আমরা নামটা claim করলাম।* [৪৮]

১৯৭০ সালে লেনিনের জন্মদিনে 'লেনিনের ডাক' নাটকটি 'লিট্‌ল থিয়েটার মিনার্ভাতে' শেষ অভিনয় করেছিল। প্রচুর টাকার ঋণ মাথার উপর নিয়ে উৎপল দত্ত ও তার সহকর্মীরা বেরিয়ে এলেন 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ' থেকে। 'মিনার্ভা'কে বিদায় জানালেন। উৎপল দত্তের কাছে মিনার্ভা থিয়েটার'-এর দিনগুলি, সোনালী দিনগুলি স্মৃতি হয়ে গেল। লিটল থিয়েটার গ্রুপে নাটকের যবনিকা পতন ঘটল।

> *লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ নাট্য-আন্দোলন থেকে বিদায় নিল। কিন্তু ততক্ষণে তার গর্ভে জন্ম নিয়েছে পিপ্‌ল্‌স্ লিট্‌ল থিয়েটার।* [৪৯]

পিপ্‌ল্‌স্ লিট্‌ল থিয়েটার পর্ব :

'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের' গর্ভে জন্ম নিয়েছিল 'পিপ্‌ল্‌স্ লিট্‌ল থিয়েটার। এই 'লিট্‌ল থিয়েটারের' আদর্শে অবিচল থেকে পথ চলা শুরু করল 'পিপ্‌ল্‌স্ লিট্‌ল থিয়েটার'। অর্থাৎ 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের' বৈপ্লবিক আন্দোলন, 'লিটল থিয়েটার গ্রুপের' নাটক মার্কসবাদ, লেনিনবাদ আলোচনা প্রভৃতি আদর্শকে সামনে রেখে পিপ্‌ল্‌স্ লিট্‌ল থিয়েটার-এর পথ চলা শুরু। একথা স্মরণীয় যে উৎপল দত্ত যে সময় 'পিপ্‌ল্‌স্ লিট্‌ল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেসময় থেকে তিনি নিয়মিত যাত্রাপালার কাজ শুরু করেন পালাকার ও পরিচালক হিসেবে। একই সময়ে তিনি চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসেবেও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হন। উৎপল দত্ত চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেছিলেন পঞ্চাশের দশক থেকে। তখন তিনি চলচ্চিত্রের নিয়মিত অভিনেতা ছিলেন না। 'মাইকেল মধুসূদন' ছবিতে অভিনয় করে ব্যাপক সাফল্যের পরেও তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করার বিশেষ সুযোগ পাননি কারণ এই চলচ্চিত্রে অনেক ইংরেজি সংলাপ ছিল। তাই অনেকে ভাবতে

শুরু করলেন যেসব চলচ্চিত্রে চরিত্রের ইংরেজি সংলাপ আছে সেইরকম চরিত্র ছাড়া তার অভিনয় সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রে তার কাজ না পাওয়ার আরেকটি কারণ হিসেবে উৎপল দত্ত বলেন—

> *পরিচালকদের ধারণা থিয়েটারের অভিনেতারা ফিল্মের পক্ষে অচল... এইসব পরিচালকেরা কোন খোঁজ রাখেন না, রাখার চেষ্টাও করেন না। ব্রিটেনের সব অভিনেতাই মঞ্চ থেকে এসেছেন। ... মঞ্চের অভিনেতা ফিল্মে অচল, এ এক অদ্ভুত ধারণা। এই ধারণায় আমার কাজ না পাওয়ার অন্যতম কারণ।* [৫০]

পরিচালকদের এইরকম ধরনের মানসিকতার ফলে উৎপল দত্তের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেরকমভাবে চলচ্চিত্রে অভিনয় করে ওঠা হয়নি। তবে যে চলচ্চিত্রে ইংরেজি সংলাপ থেকেছে তখন উৎপল দত্ত-র স্মরণ নেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ চলচ্চিত্রে ইংরেজি সংলাপগুলো ডাক্তারের বা উকিলের মুখ দিয়ে বলানো হত। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলা ছবিতে উকিলের ভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন। সে সময় সারা বছরে সেরকম কাজ পেতেন না বললেই চলে তবুও তিনি যতটুকু পেতেন ততটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করতেন। তাকে কৌতুক করে বললে শোনা যায়—

> *আমি হয়ে গেলাম বাংলা ছবির ডাক্তার অথবা উকিল। আমি সতেরোটা ছবিতে পরপর উকিলের ভূমিকায় অভিনয় করেছি। ... একদিন জহর রায় আমাকে বললেন— উৎপল, তুই এবার আদালতে প্র্যাকটিশ শুরু কর। যে সতেরোটা ছবিতে উকিলের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে, সে ওকালতি করবার অবশ্যই অধিকারী।* [৫১]

চোদ্দ বছর অতিক্রান্ত করলেন, সারা বছরে হয়তো কাজ পেতেন সব মিলিয়ে দশ দিন। সত্তরের দশক থেকে উৎপল দত্তের পরিস্থিতি পালটাতে শুরু করে। ১৯৭০ সালে মৃণাল সেনের বিখ্যাত ছবি 'ভুবন সোম'-এ অভিনয় করলেন এবং সেই অভিনয় সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে মনোনীত হন এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার স্বরূপ উৎপল দত্ত 'ভরত' পুরস্কারে ভূষিত হন। এরপর 'ফরিয়াদ' ছবিতে অভিনয় করার পর তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি, উচ্চ প্রশংসিত হন তিনি। এইসময় থেকে তিনি বাংলা ও হিন্দি ছবিতে নিয়মিতভাবে অভিনয় শুরু করেন।

উৎপল দত্তের জীবনের সামগ্রিক দিক ও উৎপল মানসকে বোঝার জন্য চলচ্চিত্রের মতো যাত্রা সম্পর্কে সেই সময় তার ভাবনাচিন্তা কী ছিল তা নিয়ে সামগ্রিক আলোচনার প্রয়োজন। উৎপল দত্ত যাত্রা জগতে যুক্ত হওয়ার আগে মহলার কাজ চলত অবৈজ্ঞানিকভাবে। তখন—

যাত্রা পরিচালকের মাধ্যম ছিল না, প্রধান অভিনেতারাই যাত্রা নির্দেশনার কাজ চালাতেন। [৫২]

সেসময় পালা সৃজনে অভিনেতারা কোনোরকম শৃঙ্খলা নিয়ম মানতেন না তাদের মধ্যে সবসময় স্বেচ্ছাচারিতার ভাব প্রকট হয়ে উঠত। উৎপল দত্ত যাত্রায় এসে প্রথমেই নিয়ম শৃঙ্খলায় যাত্রাদলকে বাঁধলেন, মহলায় শুরু করলেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিল্পীদের পাঠ মুখস্থ করা বাধ্যতামূলক করলেন, শিল্পীদের অভিনয় শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলেন। পরিচালক হিসেবে উৎপল দত্ত যাত্রায় যোগ দেওয়ার পর যাত্রা শিল্পে এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। যাত্রার বহু নামিদামি অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা স্বীকার করেছিলেন—

এতদিনে একজন প্রকৃত গুরু পাওয়া গেল, একজন যথার্থ শিক্ষক পাওয়া গেল। [৫৩]

উৎপল দত্ত মনে করতেন যাত্রাপালায় যারা অভিনয় করেন তাদের দক্ষতা তাদের অভিনয় ক্ষমতা চলচ্চিত্র ও নাট্যশালার থেকে অনেক বেশি। তিনি তাদেরকে আরও উন্নত ও আধুনিক অভিনেতা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। কেননা উৎপল দত্ত মনে করতেন—

বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যাত্রাতেই আছে। তারা চলচ্চিত্রে নেই, তারা নাট্যশালায় নেই, তারা নাট্য-আন্দোলনে তো নেই-ই। তারা সব যাত্রায়। [৫৪]

উৎপল দত্ত যাত্রায় শৃঙ্খলা-নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা করা এবং শিল্পীদের আধুনিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি তিনি যেটা করেছিলেন সেটা হল— রাজনীতিকে সরাসরি যাত্রায় নিয়ে আসা। কিন্তু অভিনেতা অভিনেত্রীরা রাজনৈতিক কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন, তাদের মনে হচ্ছিল এর ফলাফল কী হবে, লোকে ভালোভাবে নেবে কিনা এসব নিয়ে তারা সংশয় প্রকাশ করছিলেন। প্রাথমিকভাবে সমস্যা হলেও উৎপল দত্ত যাত্রার মধ্যে এমন এমন বিষয় সংযোগ করেছেন, এমন কথাবার্তা বলেছেন তাতে যাত্রাপাত্রা আরও ভালোভাবে চলেছে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন—

অনেক পালা হতে শুরু করল যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক পালা।... এবং যাত্রার অভিনেতারা সফলভাবে অভিনয় ক'রে সে-পালাগুলোকে Hit করালেন। [৫৫]

উৎপল দত্ত যাত্রা জগৎকে রাজনৈতিক চেতনা দেওয়ার পর দুটি বিষয়ের উপরে বিশেষ করে নজর দিলেন— প্রথমত শিল্পের অর্থাৎ শিল্পের ঘটনাবলি দেশীয় ভাবাবেগের সঙ্গে জড়িত থাকবে। দ্বিতীয়ত, যাত্রার কলাকুশলীদের সহজ সরল ভাষার ব্যবহার ও কৌশল, যাতে জনগণের সঙ্গে অতি সহজভাবে সংযোগ স্থাপন করা যায়। তিনি মনে করতেন শিল্প-সাহিত্যের বিষয়বস্তু

সব সময় বৈপ্লবিক হওয়া প্রয়োজন এবং তার আঙ্গিক হবে একান্তভাবে জাতীয়। মার্কসবাদী হিসেবে উৎপল দত্ত দেশীয় বৈপ্লবিক কাহিনি, বিভিন্ন আন্দোলনকে যাত্রায় আনার চেষ্টা করলেন, যাতে সেই বৈপ্লবিক কাহিনি ও সংগ্রামের কাহিনি অতি সহজেই মানুষের মধ্যে প্রচার করা যায় ও সামনে তুলে ধরা যায়। যাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লিখেছেন—

> *জাপানিদের কাছে বিপ্লবের বার্তা হয়তো কাবুকি-মারফৎ সবচেয়ে দ্রুত পৌঁছে দেয়া যাবে, বাংলার মানুষের কাছে যাত্রায়, আর দক্ষিণ ভারতে নৃত্য মারফৎ, মহারাষ্ট্রে তামাশায়, উত্তরপ্রদেশে নৌটংকিতে, গুজরাটে ভাওয়াইয়ে।* [৫৬]

যাত্রার উপাদান যেহেতু দেশজ তাই ভরপুর, বিভিন্ন বৈপ্লবিক কাহিনিকে কেন্দ্র করে যাত্রা নির্মিত হওয়ার জন্য উৎপল দত্ত ভাবছিলেন—

> *যাত্রার উপাদানকে থিয়েটারে নিয়ে আসা প্রয়োজন।* [৫৭]

তিনি থিয়েটার ও যাত্রাকে মেলানোর লক্ষে ধাবিত হলেন যাত্রাও থিয়েটারকে এক করা যায় কিনা তা নিয়ে মৌলিক ও নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন দীর্ঘ সময় ধরে। বলাবাহুল্য তিনি এই নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন কীভাবে যাত্রা ও থিয়েটারের মেলবন্ধন ঘটানো যায়। এই প্রচেষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ তার বিখ্যাত নাটক 'টিনের তলোয়ার'।

পিপ্‌ল্‌স্ লিট্‌ল্ থিয়েটার স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করেন 'টিনের তলোয়ার' নাটকটি নিয়ে। এ নাটকটি ১৯৭১ সালে মঞ্চস্থ হয়েছিল। এটা বোধহয় উৎপল দত্তের সবচেয়ে উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় নাটক। বাংলা নাটকের ঐতিহ্যকে নিয়েই মূলত এ নাটকটি লেখা হয়। শুধুমাত্র অতীতের স্তুতি ও মহিমা কীর্তন করা নয়, রাজনৈতিক থিয়েটার ও রাজনৈতিক নাট্য আন্দোলনে উন্মেষ লগ্নের কাহিনি শুনিয়ে ছিল 'টিনের তলোয়ার'। এ নাটকে তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতকে মূল্যায়নের প্রবৃত্ত হলেন। বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্ম দিনের সময়কার সামাজিক দ্বন্দ্ব ও তৎকালীন সমাজের চিন্তা ও বিভিন্ন সংঘর্ষগুলিকে অতি নিবিড়ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন আলোচ্য নাটকে। উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসন কীভাবে বিদ্রোহী নাটকের কণ্ঠ রোধ করেছিল এবং পিষে মারার চেষ্টা করেছিল এবং তার মধ্য থেকে কীভাবে বাংলা নাট্যশালা এই নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সদর্পে রুখে দাঁড়িয়ে ছিল তারই এক অবিস্মরণীয় সত্যনিষ্ঠ আলেখ্য টিনের তলোয়ার।

এরপর উৎপল দত্ত পরপর প্রযোজনা করলেন 'ব্যারিকেড' ১৯৭২ সালে। যেটি ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস অত্যাচারকে জার্মানির পটভূমিকায় তুলে ধরা হয়েছিল। 'ব্যারিকেডের'

পরের নাটক ছিল 'টোটা' এটি প্রযোজনা করেছিলেন ১৯৭৩ সালে। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় উৎপল দত্ত এই নাটকটি লিখেছিলেন। ১৯৭৪ সালে তিনি প্রযোজনা করলেন 'দুঃস্বপ্নের নগরী'। এই নাটকটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের এক প্রামাণ্য ইতিহাস। ১৯৭১-৭৪ সালে ঘটে যাওয়া কংগ্রেসি সন্ত্রাসকে এ নাটকে উৎপল দত্ত তুলে ধরেছেন। এই নাটক এমন প্রভাব পড়েছিল যে যখনই নাটকটি অভিনীত হচ্ছিল তখনই আক্রান্ত হচ্ছিল। উৎপল দত্তের কথায়—

> *নাটকটা কার্যত ব্যান্ড হয়ে গেছিল। তা বলে থামেনি। অভিনয় হত। অন্য নামে। 'কলকাতার কড়চা', কত রকম নাম। পশ্চিমবঙ্গে বহু জায়গায় অভিনয় হয়ে গেল। শুধু নামটা পালটে দিত স্থানীয় কমরেডরা।* [৫৮]

১৯৭৫ সালের জুন মাসে জরুরি অবস্থা জারি হয় ভারত জুড়ে। এই জরুরি অবস্থার পটভূমিতে উৎপল দত্ত লেখেন 'এবার রাজার পালা' ১৯৭৫ সালে। 'তিতুমীর' নাটক মঞ্চস্থ করলেন ১৯৭৮ সালে। এইসময় কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল অকংগ্রেসি সরকার যাদের সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হত। এই সময় যেসব নাটক তিনি প্রযোজনা করেছিলেন সেগুলির মধ্যে স্পষ্ট স্বৈরতন্ত্র বিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ভাবনা পরিলক্ষিত হয়। 'তিতুমীর' সেই ধরনের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাটক, যার বিষয়বস্তু ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলিমদের আপসহীন সংগ্রাম।

১৯৮৩ সাল ছিল কাল মার্কস-এর মৃত্যু শতবর্ষ। কাল মার্কস-এর মৃত্যু শতবর্ষকে উপলক্ষ্য করে ও কাল মার্কসের জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়কে অবলম্বন করে উৎপল দত্ত নাটক লেখেন 'শৃঙ্খল ছাড়া' ১৯৮৩ সালে। নাটক সৃষ্টি হয়েছিল জার্মানির একটি পরিবহনকে অবলম্বন করে। ১৯৮৪ সালে উৎপল দত্ত লেকেন 'কুশপুত্তলিকা'। এই নাটকে উৎপল দত্ত মার্কসবাদের বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বের অসামান্য প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তিনি উন্মোচন করেছেন ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণির নগ্ন চেহারা। 'আজকের শাজাহান' প্রযোজনা করেন ১৯৮৫ সালে। এ নাটকের বিষয়বস্তু ছিল এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ অভিনেতার জীবন আলেখ্য। ১৯৮৮ সালের শেষের দিকে উৎপল দত্ত প্রযোজনা করলেন সমাজ সংস্কাররমূলক নাটক 'অগ্নি সজ্জা'। রাজা রামমোহন রায়ের সমাজের বিরুদ্ধে যে কুসংস্কার বিরোধী সংগ্রাম ছিল তা অবলম্বন করে উৎপল দত্ত এই নাটকটি রচনা করেন। ১৯৮৯ সালে উৎপল দত্ত প্রযোজনা করেন 'নীল সাদা লাল' নামক নাটকটি। এটি ফরাসি বিপ্লবের দ্বিশত বর্ষ উপলক্ষ্যে রচনা করেন। ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে উৎপল দত্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নাটক প্রযোজনা করেন 'একলা চলো রে'। দেশভাগের চক্রান্ত ও মহাত্মা গান্ধির

হত্যার ঘটনা নিয়ে এই নাটকটি তিনি রচনা করেন। ১৯৯০ সালে লিখলেন 'লাল দুর্গ' নামক নাটক। এই নাটকের পটভূমিকা হিসেবে আমরা দেখি লিভোনিয়া নামক একটি কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। লিভোনিয়া আসলে রোমানিয়া। রোমানিয়া রাষ্ট্রপতি চেসেস্কু সমাজতন্ত্রের শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, ফলস্বরূপ চেসেস্কু ও তার স্ত্রীর করুণ পরিণতি আলোচ্য নাটকে দেখানো হয়েছে। ১৯৯১ সালে তার শেষ নাটক লেখেন 'জনতার আফিম'। উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক অন্ধকার পরিবেশের বিরুদ্ধে লিখলেন এই নাটকটি। কিছু কিছু সুযোগ সন্ধানী ও সুবিধাবাদী মানুষ ধর্মকে আফিমের নেশার মতো কাজে লাগায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য— সে কথাই উৎপল দত্ত এই নাটকে বলার চেষ্টা করেছেন।

উৎপল দত্তের শেষ অভিনয় ৩ আগস্ট ১৯৯৩ সালে কলকাতার রবীন্দ্রসদন মঞ্চে। 'একলা চলো রে' নাটক গান্ধিবাদী নেতা অনাথবন্ধু চক্রবর্তীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এরপর থেকে তিনি আর কোনো নাটক রচনা করেননি ও অভিনয় করেননি কারণ শরীর তার সাথ দিত না। এসময় প্রকৃতপক্ষে উৎপল দত্ত খুবই অসুস্থ ছিলেন, তাঁর ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবেটিসের সমস্যা তো ছিলই তারই সঙ্গে সঙ্গে ব্লাডপ্রেসার, স্নায়বিক সমস্যা, কিডনির সমস্যা, চোখের সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন।

> *ইতিমধ্যে ওইদিকে শতকরা সত্তর ভাগ রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আছে, ... ডাক্তারদের মত, দশ মিনিটেই জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে, আবার দশ বছরও বাঁচতে পারে।* [৫৯]

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি নিরলসভাবে প্রতিবিপ্লবের মতো জটিল পরিশ্রমসাধ্য গ্রন্থ লিখেছিলেন ১৯৯৩ সালে যা আমাদের অবাক করে। অভিনয়ের মধ্যেই তিনি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন। ক্লান্তি এসেছে, অবসাদ এসেছে, শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কখনো কখনো কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন, বিনা বিচারে বন্দি অবস্থায় জেলে কাটিয়েছেন, রাজনৈতিক মতভেদের শিকার হয়েছেন, পুলিশ ও গুণ্ডার নির্যাতন সহ্য করেছেন। এতকিছু সামলে নিয়ে তিনি বারে বারে থিয়েটারের অভিনয়ের জগতে ফিরে এসেছেন, নাটক লিখেছেন, নাটক পরিচালনা করেছেন শত বাধা সত্ত্বেও নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। সমস্ত জীবনব্যাপী নাট্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। থিয়েটারই ছিল তার জীবনের প্রথম ও শেষ আস্তানা। শেষের দিকে তার শরীর অবসন্ন ও বেহার হয়ে পড়েছে, শেষ সময় ডাক্তারের কাছে কাতরভাবে অভিনয় করার জন্য অনুনয়-বিনয় করেছেন। 'আজকের শাহজাহান' নাটকের কুঞ্জ বিহারীর সংলাপ—

> *নাটক আমার জীবন, নাটক না করতে পারলে আবার বেঁচে থেকে লাভ কী?* [৬০]

এ সংলাপ যেন উৎপল দত্তের একান্ত মনেরই কথা।

কারাবাস ও মুচলেকা প্রসঙ্গ

নাটকের মধ্যে গণমানুষের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে উৎপল দত্ত দু'বার কারারুদ্ধ হয়েছেন। প্রথমবার কারারুদ্ধ হন ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে নৌবিদ্রোহ কেন্দ্রিক নাটক 'কল্লোল'-এর জন্য। দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হন ১৯৬৭ সালে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে লেখা 'তীর' নাটকের জন্য। 'কল্লোল' নাটকে স্বাধীনতা সংগ্রামী নাবিক, মজুতদের বীরত্ব কথা যেমন উৎপল দত্ত তুলে ধরেছেন সেই সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী বেইমান কংগ্রেসি শাসকদের মুখোশ খুলে ফেলেছেন, তাদের দেশদ্রোহিতার কথা উন্মোচন করেছেন। 'কল্লোল' নাটক এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, গ্রাম-গঞ্জ-মফস্সল থেকে মানুষের ঢল নামত প্রতিনিয়ত। ফলে শাসকশ্রেণির নেতারা যেনতেন প্রকারে 'কল্লোল'-কে স্তব্ধ করে দিতে বদ্ধ পরিকর হয়ে উঠেছিল। তাদের নিয়োজিত গুণ্ডাদের দ্বারা বিভিন্নভাবে ভীতি প্রদর্শন করে 'কল্লোল'-কে বন্ধ করতে অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু 'কল্লোল' তথা মিনার্ভা থিয়েটারকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল সি পি আই (এম)। ফলে শাসক দলের পরিকল্পনা ও অভিপ্রায় ব্যর্থ হল। শাসকগোষ্ঠী এবার ব্যর্থ মনোরথে 'কল্লোল'-কে ও মিনার্ভাকে তছনছ করে দিতে অন্য পথের আশ্রয় গ্রহণ করে। এক সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত জানিয়েছেন—

> ''কল্লোল'-কে উঠিয়ে দেবার জন্য ওরা একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল। কিছুতেই যখন বন্ধ করা যাচ্ছে না, কোনো আইন হাতে নেই, তখন ওরা ...চেষ্টা করলো আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে যদি থামানো যায়।''[৬১]

ছলে-বলে-কৌশলে উৎপল দত্তকে গ্রেপ্তারের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া তাদের আর উপায় ছিল না। সেইসময় উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার নানা মিথ্যা উপাদান সংগ্রহ করে নাটকগোষ্ঠী এবং উৎপল দত্তকে গ্রেপ্তার করার প্রস্তুতি নিতে থাকল কংগ্রেসি শাসক দল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল মিনার্ভা থিয়েটারের অন্যান্য কর্মীদের হুমকি ও বিভিন্ন ভুয়ো ফোনে উৎপাত। উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হল ও শেষে বিভিন্ন ইনফরমার সূত্রে ও খবর পেয়ে পুলিশ উৎপল দত্তকে গ্রেপ্তার করে। — ''অবশেষে '৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে আমি বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হই।''[৬২]

উৎপল দত্ত কারারুদ্ধ হয়ে রইল বিনা বিচারে। এমতবস্থায় 'লিট্‌ল থিয়েটার'-এর অন্যতম প্রধান চিন্তা হয়ে দাঁড়াল কীভাবে 'কল্লোল' নাটকের অভিনয় চালিয়ে যাওয়া যাবে ও মিনার্ভা থিয়েটারকে রক্ষা করা যাবে। কলাকুশলীদের মধ্যে অনেক আলাপ আলোচনার পর গ্রুপের মিটিং-

এ স্থির হল 'কল্লোল' নাটক যেমন চলছে তেমনই চলবে— কোনভাবেই আত্মসমর্পণ করা চলবে না। 'কল্লোল' নাটকের প্রধান চরিত্র সার্দুল সিং-এর ভূমিকায় অভিনয় করতেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। তার কাছে নানারকম হুমকি ও উড়ো ফোন আসা সত্ত্বেও এবং গ্রেপ্তারের ভীতিপ্রদর্শন করার পরেও তিনি অভিনয় চালিয়ে গেলেন মানসিক দৃঢ়তার সঙ্গে। 'কল্লোল' নাটক করার জন্য কারাবাসের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপল দত্ত লিখলেন—

> "শাসক শ্রেণির কুৎসা চিরদিন পার্টির তথাকথিত দেশদ্রোহিতার বিশ্লেষণেই মূঢ়ভাবে সীমাবদ্ধ। নানা নাটক মারফৎ ইতিহাসের নানা ঘটনা তুলে ধরে কমিউনিস্ট পার্টির ত্যাগ ও আপসহীন লড়াইয়ের কথা তুলে ধরতে হবে। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের অবিচ্ছিন্ন ও নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার ধারাটাকেও সবলে ছুঁড়ে মারতে হবে কুৎসাকারীদের মুখে। স্বভাবতই ধনিকশ্রেণির পত্রিকাগুলো শৃগাল রবে সোচ্চার হল। তবে নেহাৎই গণ্ডমূর্খ বলে সমালোচকেরা যুৎসই কোনও জবাব পেলেন না, মূর্খতাই প্রকাশ করতে লাগলেন। তবে মূল সুরটি স্পষ্ট— এ-নাটকের অভিনয় বন্ধ করা উচিত, পুলিশ ঘোড়ার ঘাস কাটছে কেন?... সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ভূমিকায় অবতীর্ণ হল শোধনবাদী সিপিআই। লালঝাণ্ডাকে কেন নাটকে এত সম্মান দেখানো হয়েছে এমন প্রশ্ন তুলল না, কংগ্রেসী মাস্তানরা নয়— সিপিআই-এর সব পত্রপত্রিকা। কলকাতা-দিল্লী-বোম্বাই থেকে। নিজেদের অতীতকেও আর সহ্য করতে পারছিলেন না পুঁজিপতির এই লাল ঝাণ্ডাধারী কেরানিরা। তাঁরা সমস্বরে পুলিশকে উস্কানি দিতে লাগলেন গ্রেপ্তার ও নিষিদ্ধকরণে।"[৬৩]

উৎপল দত্তের গ্রেপ্তারের পর জোছন দস্তিদারকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাটকটি প্রকাশের জন্য। স্টেট্‌সম্যান ছাড়া সব ধরনের পত্রিকায় লিট্‌ল থিয়েটারের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হয় সুপরিকল্পিতভাবে। এত অত্যাচার, ভীতিপ্রদর্শনের পরেও সিপিএমের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে এক ব্যাপক আন্দোলন 'কল্লোল'-এর সমর্থনে। গ্রাম থেকে শহরে 'কল্লোল' নাটকের সমর্থনে পোস্টারে ভরে যায়। কমরেডরা মুখে মুখে বিভিন্ন পথসভা করে ও প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন। সমস্ত শিল্পী কলাকুশলী, সমস্ত প্রকার হুমকি মস্তানদের দেখানো মৃত্যুভয় সমস্ত বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে নাটকে অভিনয় করে যেতে থাকেন। এইসময় কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে মিনার্ভা পর্যন্ত বিশাল মশাল মিছিল করে গণনাট্যের শিল্পীরা। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয় মুখোপাধ্যায়, সান্তনু বোস প্রভৃতি কলাকুশলীর দুঃসাহসিক আদর্শে 'লিট্‌ল থিয়েটার' স্বমহিমায় চলতে থাকল আর দিনের পর দিন শ্রমিক ও ছাত্ররা সদা পাহারায় নিযুক্ত থাকলেন সরকারি গুণ্ডাদের প্রতিরোধে। সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও বলপ্রয়োগকে ব্যর্থ করে কল্লোল নাটক এক নাগাড়ে চলেছিল ৮৫০ রাত্রিব্যাপী।

উৎপল দত্ত জেলখানায় থাকাকালীন দুটি নাটিকা অভিনয় করেছিলেন— 'কঙ্গর কারাগারে' ও স্তালিনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'লৌহমানব'। নাটক দুটি অভিনীত হয় ওই বছরেই ৭ নভেম্বর। জোছন দস্তিদার ও ছাত্র ফেডারেশনের কয়েকজন কমরেড মিলে অভিনয় করেছিলেন। উৎপল দত্তের মুক্তির দাবিতে এবং 'কল্লোল' নাটকের সমর্থনে শুধুমাত্র দেশে নয় বিদেশেও সংস্কৃতির জগতে বিশেষ সাড়া পড়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়ান কবি দোলমাতোভ্স্কি, জার্মান বিশিষ্ট নাট্যকার ফন কুবা ও জার্মান পরিচালক হান্স্ পের্টেন লন্ডনে ওয়াল্টার নান মার্কিন আন্ডারগ্রাউন্ড থিয়েটারের জোসেফ সেলবি 'কল্লোল' ও উৎপল দত্তের সমর্থনে বিশেষ বিবৃতি প্রদান করেন।

১৯৬৬ সালে সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী খাদ্যের তীব্র সংকট দেখা দেয়। চারিদিকে শুরু হয় আন্দোলন ও বিদ্রোহ। ১৯৬৬-র মার্চ মাসেই এই খাদ্য আন্দোলনের সংগ্রামে জনগণ সরকারের উপরে চড়াও হয় ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তারা সমস্ত রাজবন্দিকে ছিনিয়ে আনলেন কারাগার থেকে। তাদের সঙ্গে উৎপল দত্তও মুক্তি লাভ করেন। ৭ মে মনুমেন্টের ময়দানে 'কল্লোল' নাটকের সাফল্য উপলক্ষ্যে কল্লোল বিজয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ মানুষের সমাবেশ ঘটে ও তাদের সামনে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে ও নেতৃত্ববৃন্দকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় যারা 'কল্লোল' ও মিনার্ভাকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ পরিশ্রম করেছিলেন। মনুমেন্টের ময়দানে সেই বিজয় উৎসব অনুষ্ঠানে উৎপল দত্ত লিখেছেন—

> "মিছিল আসছিল চারদিক থেকে। রবীন্দ্রনাথের 'কিষাণের জীবনের শরিক যে জন' উদ্ধৃতি বিরাট পোষ্টারে লিখে বহন করে আনছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মীরা। রোবসনের চিত্র আনছিলেন আরেক দল। গোর্কির শ্রমকঠিন মুখ জেগে ছিল আরেক মিছিলের মাথায়। ... আর নানা সহযোগী নাট্যসংস্থা ফুলে ফুলে ভরে দিলেন মঞ্চ ও আমাদের মন।"[৬৪]

উৎপল দত্ত দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হন ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'তীর' নাটকের জন্য। উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়ি বিদ্রোহ শুরু হয় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে। তখন পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের নির্দেশে উত্তরবঙ্গের প্রসাদুজ্যোতে আদিবাসী কৃষকদের ওপরে নৃশংস পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উৎপল দত্ত 'তীর' নাটক করা জন্য মনস্থির করেছিলেন। নকশালবাড়ির আন্দোলনের শুরু থেকেই উৎপল দত্তের মধ্যে অতি বাম রাজনৈতিক আদর্শ ও অতি বাম রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতভেদ শুরু হয় ও ক্রমে বাড়তে থাকে। ফলস্বরূপ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ১লা মে কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে দ্বিখণ্ডিত হয় ও নতুন রাজনৈতিক দল কমিউসিস্ট পার্টি (মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট)। এই রাজনৈতিক দলের নেতা

ছিলেন চারু মজুমদার, জঙ্গল সাঁওতাল, কানু সান্যাল, সুশীতল রায়চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ। উৎপল দত্ত এই নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন এবং মুক্তিকামী মানুষের স্বার্থে এই আন্দোলনকে যথার্থ বলে তিনি মনে করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল সি পি আই (এম)-এর গণমানুষের মঙ্গলসাধানার্থে বৈপ্লবিক সত্তা স্তিমিত হয়ে আসছে। ফলে নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানের ঘটনাকে সরাসরি সমর্থন করেন এবং নকশাল আন্দোলনের সমার্থক হয়ে উঠলেন।

উৎপল দত্ত আদ্যন্ত মার্কসবাদে বিশ্বাসী হলেও, বামপ্রগতিশীল রাজনীতির একনিষ্ঠ সমর্থক হলেও কখনো কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে এভাবে ইতিপূর্বে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেননি। কিন্তু ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে নকশালবাড়ি আন্দোলনের ফলে উৎপল দত্ত একেবারে সর্বক্ষণ রাজনৈতিক কর্মীর মতো নকশাল বাড়ির রাজনীতির ধারক ও বাহক হয়ে পড়লেন। সেকথা উৎপল দত্ত নিজেই স্বীকার করেছেন—

> "After Din Badaler Pala begins my period of political deviation, crudle mistakes, insufferable arrogance. I sided with the growing circle of left-extremists within the CPI (M), who began to swear by immediate armed insurrection. Where the arms would come from nobody appeared to know."[৬৫]

'তীর' নাটক মঞ্চস্থ করার বিষয়ে 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এর অনেকের মধ্যে নানা মতভেদ ছিল, সবাই উৎপল দত্তের সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি। উৎপল দত্তের নকশালবাড়ি সম্পর্কে অতি উৎসাহকে সংযত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অনেকে এই অতি বাম রাজনৈতিক লাইন নেওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে উৎপল দত্তকে আরও গভীরভাবে ভেবে দেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু উৎপল দত্তের স্পষ্ট ভাষার ঘোষণা ছিল—

> "There are no lies in "The Arrow". I never deliberately lie in my plays. The heroism of the peasants and the wanton brutality of the police are true; it was a moment in class-struggle, a focussed hour of history, an enplosion of class-conflict in utter nakedness, without any of the disguises and apparent truce which are the necessary daily excercise of peasant associations."[৬৬]

'তীর' নাটক যেহেতু যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে তাদের বলগাহীন অত্যাচারের কথা তুলে ধরেছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই উৎপল দত্ত কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের সরকারের শত্রুতে পরিণত হন। 'তীর' নাটকের মহড়া চলাকালে উৎপল দত্তের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয় ১২ নভেম্বর। তিনি আত্মগোপন করেন। ফলে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী পরিচালক হিসেবে 'তীর' নাটকের

অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকেন। ১২ নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত উৎপল দত্ত আত্মগোপন করে থাকায় তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত তিনি স্বেচ্ছায় পুলিশের হাতে ধরা দিয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি'তে তিনি বলেছেন—

> ''অর্থাৎ আমি ধরা দিই স্বেচ্ছায়। বেলা দুটো থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত ক্রফোর্ড মার্কেটে গোয়েন্দা পুলিশের সদর দপ্তরে আমাকে জেরা করা হয়। সেসব ভয়ঙ্কর প্রশ্ন, মনে হচ্ছিল বোম্বাই-এর পুলিশ আমাকে কোনো সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নেতা বলে ঠাউরেছেন। মাঝে মাঝে হেসে ফেলেছিলাম। আমি যে একজন সামান্য অভিনেতা এটা বোঝানো দায় হয়ে উঠেছিল। প্লেনে চড়িয়ে আমাকে নিয়ে এল কলকাতায়, দমদম থেকে সোজা দমদম জেলে।''[৬৭]

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে উৎপল দত্ত যখন 'তীর' নাটক প্রযোজনার জন্য গ্রেপ্তার হলেন তখন তিনি ব্রিটিশ প্রযোজক 'গুরু' নামক চলচ্চিত্রের অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। প্রযোজক ছিলেন ইসমাইল মার্সেন্ট এবং জেম্‌স আইভরি। 'গুরু' চলচ্চিত্রের অভিনয় মহড়া যখন প্রথমে চলছিল তখন বোম্বে অবস্থানরত উৎপল দত্তকে ২৪ ডিসেম্বর রাতে মুম্বাইয়ের তাজ হোটেল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২৬ ডিসেম্বর কলকাতার দমদম জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উৎপল দত্তের গ্রেপ্তারির কারণে 'গুরু' চলচ্চিত্রের প্রযোজক ও কর্তা ব্যক্তিরা মহাসংকটের সম্মুখীন হন। ফলে ১৯৬৮ সালে প্রযোজক ইসমাইল মার্সেন্ট কলকাতায় এসে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্র অভিনয়ের শর্তের ধারা অনুসারে উৎপল দত্তকে কারামুক্ত করেন। কিন্তু সরকারের লোকজন কাগজে সই করতে না করতেই রেডিও মারফত প্রচার করে দেয় উৎপল দত্ত মুচলেকা দিয়েছেন। তাঁর কারামুক্তি ও 'গুরু' ছবিতে অভিনয় নিয়ে শত্রুরা অনেক কুৎসা করেছেন। প্রচার করেছেন তিনি আর কখনো রাজনৈতিক নাটক করবেন না এই শর্তে মুচলেকা দিয়েছেন। উৎপল দত্ত উপলব্ধি করেছিলেন 'তীর' নাটকের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, হয়েছিল অন্য কারণে, এর পিছনে ছিল শত্রু ও সরকারের এক গভীর ষড়যন্ত্র। উৎপল দত্ত তাঁর কারামুক্তি ও শত্রু দ্বারা প্রচারিত কুৎসার বিষয়ে বলেছেন—

> ''মুক্তির প্রক্রিয়াটাও যেভাবে প্রচারিত সেরকম ঘটেনি। ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ অভিনেতার একদিন যেমন হাত বাঁধা থাকে, অন্যদিকে তার একটা সুযোগ থাকে অত্যাচার এড়াবার, বিশেষত যদি সেটা হয় বিরাট আন্তর্জাতিক কোম্পানি যারা প্রধানমন্ত্রীর ওপরও চাপ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সেই যে শত্রুর খিল খিল হাস্যসহ আস্ফালন, উৎপল দত্ত লিখে দিয়েছেন আর রাজনৈতিক নাটক করবেন না— তার জবাবে বলি, কাঁচকলা খাও। কিন্তু শত্রুর অপপ্রচারে লিট্‌ল থিয়টার টলেনি।''[৬৮]

মুচলেকা বিষয়ে উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে তাঁর শত্রুরা ও সরকার পক্ষ থেকে এতটাই

অপপ্রচার ও তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল যে, উৎপল দত্তের জন্য শোভা সেনকে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। উৎপল দত্ত ও শোভা সেনের অবর্তমানে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপটিতে নানা সংকট দেখা দিল, তাদের অবর্তমানে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ। ফলত, শোভা সেনকে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ থেকে যারা বহিষ্কার করে ছিল, তারাই আবার তাঁকে দলে ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারা গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিল যে শোভা সেন ও উৎপল দত্ত ছাড়া থিয়েটার চালু রাখা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, তাই তাদের বহিষ্কারের নির্দেশ প্রত্যাহার করে স্বমহিমায় তাদের দলে আহ্বান করা হয়। বলা বাহুল্য, উৎপল দত্ত মুচলেকা কি দিয়েছিলেন বা কি লিখেছিলেন তা আজও রহস্যাবৃত ও অজানা। উৎপল দত্তের মুচলেকা প্রসঙ্গে শোভা সেন লিখেছেন—

> "এর জন্য উৎপলকে শুধু লিখে দিতে হল, এই শুটিং চলাকালীন উৎপল আর কলকাতায় আসতে পারবে না, কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও জড়াবে না। প্রযোজকদের ক্ষতির কথা ভেবে এই সাময়িক আপস করতে আমাদের কিছু খারাপ মনে হয়নি। কারো সঙ্গে কনট্রাক্ট সই করলে সেখানেও একটা দায় থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা যত সহজ ভেবেছিলাম ততটা সহজ হল না।"[৬৯]

উৎপল দত্তের মুচলেকা বিষয়ে তাঁর শত্রুদের যে অপপ্রচার ছিল, তা সর্বৈব মিথ্যা রটনা। কারণ তিনি কারাবাস শেষে মুচলেখা দিয়েও 'তীর' নাটক চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতায়। মুচলেকা দেওয়ার পর জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি লিখলেন 'মানুষের অধিকারে' নাটক ও প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করলেন, পরিচালনাও করলেন। এর পরবর্তী নাটকগুলি হল 'লেনিনের ডাক', 'যুদ্ধং দেহি', 'বর্গি এল দেশে' (পথনাটক) ইত্যাদি। যার মধ্যে সরাসরি রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে ও রাজনীতির কথাই বলেছেন। এ থেকেই সহজেই অনুমেয়, উৎপল দত্ত রাজনৈতিক নাটক না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি মুচলেকা দিতেন, তাহলে ফিরে এসে আবার নিশ্চয় রাজনৈতিক নাটক রচনায় ব্রতী হতেন না। উৎপল দত্তের দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা, অভিনেতা এই মুচলেকা সম্পর্কে জানিয়েছেন—

> "মুচলেকা দিয়ে কারামুক্তির সম্বন্ধে যা শোনা যায়, ওটার কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু মুচলেকার ব্যাপারটা কেউ আজ পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারলেন না। যেটা আমি জানি, সেটা হচ্ছে এই যে, কোটি কোটি টাকার ইনভলভমেন্ট ছিল যাদের এখানে [গুরু চলচ্চিত্র নির্মাতাদের], তারা সরাসরি গেলেন ইন্দিরা গান্ধীর [তৎকালীন কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী] কাছে, সত্যজিৎ রায়ের কাছে। এবং রিলিজটা করে নিলেন যাতে কাজটা করে নিতে পারেন। মুচলেকায় কি ছিল তা আজ পর্যন্ত বেরুল না কিন্তু। ছাপাও হলো না মাঝখান থেকে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।"[৭০]

শারিরীক বিপর্যয়

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে উৎপল দত্তের ডায়াবেটিস রোগ ধরা পড়ল। সমস্ত জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম, শরীরের উপর ভয়ানক অত্যাচার এবং নিয়মকানুনে পরোয়াহীন ছিলেন। শরীরের উপরে খেয়াল না রাখা সেই সঙ্গে সঙ্গে শীরিরীক পরিশ্রমে ১৯৮৩-৮৪-র দিকে তাঁর শরীর ক্রমাগত খারাপ হতে থাকে। ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর শরীর আরো খারাপ হতে থাকে। ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর শরীর ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল এবং তিনি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েছিলেন। এই দুর্বলতা ১৯৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরও চরম বিপর্যস্ত হতে থাকে ও ক্রমাগত ভীষণ খারাপের পর্যায়ে চলে যায়। যার অন্যতম কারণ ডাক্তারের দেওয়া পরামর্শ অবহেলা করা ও শারিরীক অসুস্থতা সত্ত্বেও অনিয়মিত ও বেপরোয়া জীবন যাপন। শোভা সেন সবচেয়ে কাছ থেকে সেই পরিস্থিতি উপলব্ধি করেছেন ও তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন- ‘‘নানা রকম উপসর্গ, ব্লাড প্রেশার ও ডায়াবেটিস, এই দুই রোগই ওর শরীরটাকে কব্জা করে ফেলেছে। ওকে সাবধানে রাখাও শক্ত, ডাক্তাররা যা যা করতে বলবে, মেনে চলতে বলবে, বা খেতে নিষেধ করবে, ও তা কিছুতেই মানবে না। ওভাবে বেঁচে থাকার কোনো অর্থই ও খুঁজে পায় না’’।১

১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তাঁকে কলকাতার বেলভিউ নার্সিং থেকে ডায়ালিসিসের জন্যে ভর্ত্তি করা হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফেরার পর তাঁর শারিরীক অবস্থা ক্রমাগত ভীষণ খারাপ হতে থাকে। একই বছরের ৩-রা মার্চ আবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং মার্চের ৪ তারিখ থেকে ডায়ালিসিস শুরু করা হয়। চার, পাঁচ দিন এক নাগাড়ে ডায়ালিসিসের পর ৯ই মার্চ একটু সুস্থবোধ করতে থাকেন। তাঁর কিডনির অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়েছিলেন কিডনি পুনঃপ্রতিস্থাপন করতে হবে। কিডনি প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি ২২শে মার্চ বোম্বাই-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ওখানকার ডাক্তারবাবুরা তাঁকে পর্যবেক্ষণ করেও বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানালেন তাঁর দুর্বল হার্ট ও দুর্বল নার্ভের কারনে কিডনি প্রতিস্থাপন কোনভাবেই সম্ভব নয়। ফলে সেখানেই ডায়ালিসিস চলতে থাকল ও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল অপারেশান না করে বাড়িতে ডায়ালিসিসের বন্দোবস্ত করা।

১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রচন্ড অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রবন্ধ ‘প্রতি বিপ্লব’-এর মতো জটিল, পরিশ্রম সাধ্য দুরহ গ্রন্থ উৎপল দত্ত বিপুল উদ্যামে লিখতে শুরু করেন। তিনি হয়ত অনুভব করেছিলেন এহেন জটিল শারিরীক অসুস্থতার মধ্য দিয়ে তাঁর বেশিদিন হয়তো বেঁচে

থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি তাড়াতাড়ি শেষ করবার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। যেদিন ডায়ালিসিস থাকে না সেদিন সকালে উঠে চা খেয়েই লিখতে শুরু করতেন। শরীর কোনভাবেই তাঁর সঙ্গ দিত না। ক্ষানিকখণ লিখতেন আবার ক্ষানিকখণ বিশ্রাম করতেন, এভাবেই 'প্রতিবিপ্লব' প্রবন্ধটি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। এই সময় তাঁর শারিরীক পরিস্থিতির বর্ণনা শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। তাঁর রেটিনার পিছনে জল জমেছে, সেই সাথে ছিল উচ্চ ব্লাড প্রেশার ও ডায়াবেটিসের সমস্যা। কিছুদিন পরে শারিরীক পরীক্ষা করে জানা গেল ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনাইন অসম্ভব হারে বেড়ে গিয়েছিল। সেই সাথে সাথে নার্ভের সমস্যা। শ্রীমতি শোভা সেনের বর্ণনা অনুযায়ী—"তাঁর ডান কিড্‌নি, ডান চোখ এবং ঐদিকের ব্রেন-এর আর্টারি দুর্বল হয়ে গেছে, তার কোন চিকিৎসা নেই, ...ইতিমধ্যেই ওইদিকে শতকরা সত্তরভাগ রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আছে, ... ডাক্তারদের মত, দশ মিনিটেই জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে।"[২]

নাটকের প্রতি একান্ত প্রাণ ও নাট্যযোদ্ধা উৎপল দত্ত তাঁর শারিরীক অসুস্থতার জন্য বেশ কিছুদিন নাটক করতে না পেরে অত্যন্ত অস্থির ও মনোকষ্টে ভুগছিলেন। ডাক্তারদের নিষেধ সত্ত্বেও ডাক্তারের সাথে কথা বলে, অনুমতি নিয়ে ২১শে জুলাই 'একলা চলো রে' নাটকের অভিনয় করেছেন। এই 'একলা চলো রে' নাটক অভিনয়ই তাঁর শেষ অভিনয়। অত্যন্ত দুর্বল শরীর নিয়ে ১৮ই আগস্ট রাত্রি ৮টা পর্যন্ত 'ব্যারিকেড' নাটকে পুনঃপ্রযোজনার মহড়ায় তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মহাপ্রয়াণ:

১৯শে আগস্ট উৎপল দত্তকে পি.জি. হাসপাতাল থেকে ডায়ালিসিস শেষ করে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সেদিন সকলেও তিনি প্রবল শারিরীক কষ্ট ও জ্বর নিয়ে পরবর্তী নাটকের পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনা করেছিলেন। আগের দিন রাত থেকেই প্রবল জ্বর, সেই জ্বরকে সঙ্গে করেই তিনি লিখে চলেছিলেন। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে খুব জ্বর নিয়ে সামান্য ঘুমানোর চেষ্টা করেছিলেন। পরিবার পরিজন আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে দিন-দিন ক্রমাগত দুশ্চিন্তা বেড়ে চলেছে, কতদিন উৎপল দত্ত এই অসুখ নিয়ে যুঝতে পারবেন! এই কতদিন শেষ হয়ে এল ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসের ১৯ তারিখ । কলকাতার টালিগঞ্জের কল্লোলে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিটে। নিরন্তর ছুটে চলা নাট্য যোদ্ধা একবারেই থেমেছেন, মহাপ্রয়াণে। শোভা সেন উৎপল দত্তের জীবনের অন্তিম লগ্ন সম্পর্কে লিখেছেন- "বাড়িতে পৌঁছে আস্তে আস্তে গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। নিচে বসল না। একেবারে ওপরে এসে খেয়ে শুয়ে পড়বে। যেমন রোজকার রুটিন। কিন্তু দেখছি বেশ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, সঙ্গে একটা অস্বস্তি খেতে বসে খেতে পারলো না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল।

আমি কাছে এসে একটু স্যুপ খাওয়ানোর চেষ্টা করলাম। জিভের নিচে সরবিট্রেট দিলাম। বিছানায় শুয়ে বুকের যন্ত্রণা বাড়ল। ওঠেও যন্ত্রণা। শুয়ে বসেও যন্ত্রণা, প্রচন্ড বুকের ব্যথা ও গলায় ঘর ঘর আওয়াজ- কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। স্যুপটা দু-চামচ খেতে না খেতে গড়িয়ে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, যন্ত্রণা কমেছে, তাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু এ যে তার শেষ নিদ্রা বুঝতে পারিনি।”[৩]

মানুষের মুক্তি সংগ্রামে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত চলে গেলেন- চিরতরে চলে গেলেন সেই অনাবিস্কৃত অজানা না ফেরার দেশে, যেখান থেকে কোন যাত্রী আর কখনো ফেরে না। রয়ে গেল সেই সব কিছুই, যা তিনি মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন, সমাজের জন্য ও শিল্পের জন্য।

উৎস নির্দেশ :

১. উৎপল দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'গণশক্তি', শারদ সংকলন, ১৯৯২, পৃ ৭৪

২. শোভা সেন, 'প্রস্তুতি পর্বের উৎপল ও অগ্রজের অনুস্মৃতি', 'নন্দন' ৩০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ ৫৭

৩. উৎপল দত্ত, সুরজিৎ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'দেশ', ৩০ মার্চ ১৯৯১, পৃ ৩৫

৪. উৎপল দত্ত, সুরজিৎ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'দেশ', ৩০ মার্চ ১৯৯১, পৃ ৩৪

৫. শঙ্কর শীল, থিয়েটারে প্রবেশ, উৎপল দত্ত : মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ১৩

৬. উৎপল দত্ত, 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি', উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা), উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ৪৪৩

৭. সূত্র-৫, পৃ ১৪

৮. সৌভিক রায়চৌধুরী, 'উৎপল দত্ত কিছু স্মৃতি ও আমাদের উত্তরাধিকার', বনানী, ১৪ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ১৪০০, পৃ ১৮

৯. তদেব, পৃ ১৮

১০. 'College Notes and News', St. Xavier's Magazine, December 1948, পৃ ২৩

১১. সৌভিক রায়চৌধুরী, উৎপল দত্ত : 'মুখের ভাষা থেকে লেখার কলমে', 'কলকাতা পুরশ্রী', সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৩, পৃ ৪

১২. সৌভিক রায়চৌধুরী, 'থিয়েটারে সংলাপের পরই সর্বাধিক গুরুত্ব সংগীতের' (শেষ সাক্ষাৎকার), 'এপিক থিয়েটার', উৎপল দত্ত স্মারক সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৪, পৃ ১৯২

১৩. তদেব, পৃ ১৯২

১৪. সুরজিৎ ঘোষ, 'যে নাটকের রাজনীতি ভুল তার সব ভুল' (সাক্ষাৎকার), 'দেশ', ৩০ মার্চ ১৯৯১, পৃ ৩৫

১৫. উৎপল দত্ত, 'প্রতাপ রায়কে যেমন মনে পড়ে', উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা), উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ৪৬৫

১৬. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, 'উৎপলরঞ্জন : একটি সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ', 'এপিক থিয়েটার', মার্চ ১৯৯৬, পৃ ৫৫

১৭. তদেব, পৃ ৫৫

১৮. সূত্র-৫, পৃ ১৫

১৯. সূত্র-৬, পৃ ৪৪০

২০. সূত্র-৩, পৃ ৩৫

২১. সূত্র-৫, পৃ ১৫, ১৬

২২. সূত্র-৬, পৃ ৪৪০

২৩. সূত্র-৩, পৃ ৩৫

২৪. সূত্র-৬, পৃ ৪৪০

২৫. সূত্র-৩, পৃ ৩৫

২৬. সূত্র-৬, পৃ ৪৪০

২৭. সূত্র-৫, পৃ ১৬

২৮. সূত্র-৬, পৃ ৪৪০

২৯. উৎপল দত্ত, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'শূদ্রক', 'শরৎ', ১৪০০, পৃ ১২৫

৩০. সূত্র-৬, পৃ ৪৪৩, ৪৪৪

৩১. তদেব, পৃ ৪৪৫

৩২. সূত্র-২৯, পৃ ১২৬

৩৩. তদেব, পৃ ১২৬

৩৪. সূত্র-৬, পৃ ৪৪৫

৩৫. তদেব, পৃ ৪৪৫

৩৬. তদেব, পৃ ৪৪৫

৩৭. তদেব, পৃ ৪৪৬, ৪৪৭

৩৮. শঙ্কর শীল, 'গণনাট্যের সান্নিধ্যে', উৎপল দত্ত : মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ২৭

৩৯. সূত্র-৬, পৃ ৪৪৯

৪০. তদেব, পৃ ৪৪৯

৪১. সূত্র-২৯, পৃ ১২৯

৪২. সূত্র-৬, পৃ ৪৫১

৪৩. তদেব, পৃ ৪৫১

৪৪. তদেব, পৃ ৪৫১

৪৫. তদেব, পৃ ৪৫১

৪৬. তদেব, পৃ ৪৫১

৪৭. সূত্র-২৯, পৃ ১৩৬

৪৮. তদেব, পৃ ১৩৬

৪৯. সূত্র-৬, পৃ ৪৬২

৫০. শঙ্কর শীল, 'পিপলস লিট্‌ল থিয়েটার', উৎপল দত্ত : মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ৮১, ৮২

৫১. তদেব, পৃ ৮২

৫২. উৎপল দত্ত, 'পর্বান্তর' পত্রিকায় সাক্ষাৎকার, 'এপিক থিয়েটার', মার্চ ১৯৯৫, পৃ ৮৫

৫৩. সূত্র-২৯, পৃ ১৩৭

৫৪. সূত্র-৫২, পৃ ৮২

৫৫. সূত্র-২৯, পৃ ১৩৮

৫৬. উৎপল দত্ত, 'ব্রেখ্‌ট্‌ ও মার্ক্‌স্‌বাদ' 'স্তানিস্‌লাভস্কি থেকে ব্রেখ্‌ট্‌', উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ প্রথম খণ্ড, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ ২৮৩

৫৭. সূত্র-২৯, পৃ ১৪০

৫৮. তদেব, পৃ ১৪৪

৫৯. শোভা সেন, 'স্মরণে বিস্মরণে : নবান্ন থেকে লালদুর্গ', কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ ৩৭৬

৬০. উৎপল দত্ত, 'আজকের শাজাহান' নাটক, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, সপ্তম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-১০, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ ২২২

৬১. সূত্র-৫২, পৃ ৭৬

৬২. সূত্র-৬, পৃ ৪৫৭

৬৩. তদেব, পৃ ৪৫৭

৬৪. তদেব, পৃ ৪৫৮

৬৫. Utpal Dutt, 'Political Theatre', Towards a Revolutionary Theatre, Calcutta, 1995, M. C. Sarkar & Sons Pvt., P. 73

৬৬. তদেব, পৃ ৭৭

৬৭. সূত্র-৬, পৃ ৫৯

৬৮. তদেব, পৃ ৪৬০

৬৯. সূত্র-৫৯, পৃ ৮৯

৭০. দর্শন চৌধুরী, 'থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত', 'পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১০ অক্টোবর (মহালয়া), ২০০৭, পৃ ৩৬০, ৩৬১

৭১. সূত্র – ৫৭, পৃ ৩৬৪

৭২. তদেব, পৃ ৩৭৬

৭৩. তদেব, পৃ ৩৮০, ৩৮১